দাম : পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

২২ আগস্ট - ২০১১, ৪ ভাদ্র - ১৪১৮ ।।
৬৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা

গীতা স্কুলপাঠ্য হলে ধর্মনিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হবে?

- সীমান্ত সমস্যা মোকাবিলায় আধুনিক প্রযুক্তি নয় কেন?
- অসমে 'ডি' ভোটার ও বাঙালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

কঙ্কালকাণ্ডের কাণ্ডারীর কলঙ্কজনক নৃশংসতা প্রকাশিত হবেই ❑ ৮

সুশান্তকে বাঁচাতে আসরে আঁতেল বুদ্ধ ❑ ৯

আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সমস্যাগুলোর মোকাবিলা প্রয়োজন ❑ সাধন কুমার পাল ❑ ১১

সন্ত্রাসের উৎস সন্ধানে ❑ রাম মাধব ❑ ১৩

শ্রীমদ্‌ভাগবৎ গীতা স্কুলপাঠ্য নয় কেন? ❑ ডঃ প্রীতিমাধব রায় ❑ ১৫

ভারতীয় জীবনদর্শন ও নব্য-ভারতীয় সাহেবরা ❑ ডঃ স্বরূপ ঘোষ ❑ ১৭

অসমে 'ডি' ভোটার ও বাঙালি হিন্দুদের ভবিষ্যত? ❑ বাসুদেব পাল ❑ ২০

চৈতন্য-যুগের পরবর্তীকালে নতুন ধারার মন্দির : পর্ব ২ ❑ ডঃ প্রণব রায় ❑ ২৪

শ্রীচৈতন্যের পদধূলিধন্য গৌড়ের প্রাচীন রামকেলী মেলা ❑ তরুণ কুমার পণ্ডিত ❑ ২৫

পাক বিদেশমন্ত্রী হিনা রব্বানি-কে খোলা চিঠি ❑ সুন্দর মৌলিক ❑ ২৬

অমর স্বাধীনতা সংগ্রামী বীণা দাস-ভৌমিক ❑ ইন্দিরা রায় ❑ ২৭

আন্দোলনের প্রতীক হোন শ্রীকৃষ্ণ ❑ নটরাজ ভারতী ❑ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ **অন্যরকম : ১৯** ❑ **রাজ্যে রাজ্যে : ২১** ❑

চিঠিপত্র : ২২ ❑ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮** ❑ **শব্দরূপ : ৩২** ❑ **চিত্রকথা : ৩৩**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

গীতা স্কুলপাঠ্য হলে ধর্মনিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হবে? পৃঃ ১৫-১৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ১ সংখ্যা, ৪ ভাদ্র, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ২২ আগষ্ট - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS RNP-048/LPWP-028/2010-12

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সাগরপারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

স্বাধীন ভারতবর্ষের উন্নয়নকে ব্যাহত করিবার জন্য দেশ ছাড়িবার পূর্বে শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ প্রভুরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নামক একটি বিষবৃক্ষের বীজ এই দেশে বপন করিয়া গিয়াছিল। যাহার ফলে দেশ আজ হিংসা, দাঙ্গা এবং সন্ত্রাসবাদের স্বীকার। কিন্তু পাপ যে তাহার সৃষ্টিকর্তাকে পর্যন্ত ছাড়ে না তাহা বোধ হয় এই সুসভ্য (?) জাতটির অজানা ছিল। পাপের ফল আজ ব্যুমেরাং হইয়া সমগ্র বৃটেনকেই পুড়াইয়া দিতেছে। সোনার বৃটেন সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ এদেশে বপন করা হইয়াছিল তাহা বৃটেনের মাটিকেই রক্তাক্ত করিয়াছে বারংবার। বৃটেনেরও দীর্ঘ একটি দাঙ্গার ইতিহাস রহিয়াছে। ১৯৫০ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বারংবার দাঙ্গা বিধ্বস্ত হইয়াছে বৃটেন। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমাগত উঠিয়া আসিতেছে নানা অস্বস্তিকর প্রশ্ন। যে বহুত্ববাদ লইয়া বৃটেন গর্ববোধ করিয়া থাকে সেই বহুত্ববাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতির সত্যটি আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়িয়াছে। ১৯৮০ সালে যখন দাঙ্গা হইয়াছিল তখনও এই প্রশ্নটি উঠিয়াছিল। অপর একটি লজ্জাজনক ঘটনা হইল যে 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড' লইয়া বৃটিশ পুলিশের এত গর্ব, যাহার গোয়েন্দা বিভাগের খ্যাতি সমগ্র বিশ্বব্যাপী, তাহাও আজ প্রবলভাবে ব্যর্থ। দাঙ্গার আগাম আঁচই পায় নাই বৃটেনের পুলিশবাহিনী। তাই সমগ্র বিশ্বে নিয়মের নজির সৃষ্টিকারী বিগবেনের শহরে নৈরাজ্যের থাবা পড়িয়াছে। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভবনে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে, যথেচ্ছ লুঠপাটও চলিয়াছে। অভিযোগ উঠিয়াছে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর বালকরাই নাকি লুঠপাটের নেতৃত্ব দিয়াছে। যে দেশে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের মতো প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, সেই দেশের কিশোরদের এত অধঃপতন কেন তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। মনে হয় পাশ্চাত্য দেশসমূহের ভোগবাদী দর্শন এই অধঃপতনের মূল কারণ। বিশ্বায়নের স্পর্শে মোহাচ্ছন্ন মানুষ মূল্যবোধভিত্তিক দর্শনকে পরিত্যাগ করিবার ফলে সমদর্শিতার সংকট ঘনীভূত হইয়াছে। দুর্ভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের ভাবনা 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' আজকের দুনিয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাই এত দীনতা, সংকীর্ণতা, হানাহানি, দ্বন্দ্ব। শ্বেতাঙ্গ এবং অশ্বেতকায়দের মধ্যে বিবাদের ছবি প্রচারিত হইলেও, মূল দ্বন্দ্ব যে কাহার সহিত কাহার তাহা অদ্যাবধি পর্দার পিছনে রহিয়াছে। আসল সত্য হইল মুসলিম দুনিয়ার সহিত খৃস্টান লবির যে লড়াই আরম্ভ হইয়াছে সমগ্র বিশ্বে তাহার ছায়া বৃটেনকেও গ্রাস করিয়াছে। ক্যামেরন সরকারের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করিবার জন্য ব্যয়সংকোচের নীতি গ্রহণে এই দাঙ্গার সূত্রপাত। তবে এই কারণকেই হিংসাত্মক ঘটনাবলীর মূল হিসাবে ব্যাখ্যা করিলে তাহা ভাবের ঘরে চুরি করা হইবে মাত্র। ক্যামেরনের মতেও লুঠপাটই ছিল দাঙ্গা বাধানোর প্রধান উদ্দেশ্য। কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে দাঙ্গার পথ বেছে নেননি বিক্ষোভকারীরা। একমাত্র দারিদ্র্যই যদি লুঠপাটের প্রধান কারণ হয় তবে সরকারের সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবার একান্ত প্রয়োজন।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমাদের দেশের সহস্য সহস্র দেশভক্ত বীর ও নেতৃবৃন্দ হিন্দুস্থানের মুক্তির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। এমন কি আজও অজস্র ভারতবাসী নিয়ত নিহত হইতেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনে বহুজনকে প্রাণ দিতে হইবে। তদপেক্ষা আরও অধিক সংখ্যক ব্যক্তি আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করিবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানাটকে বহুজন তাঁহাদের নিজ অংশে অভিনয় করিয়াছেন এবং আত্মত্যাগের পথে মঞ্চ হইতে নিষ্ক্রান্তও হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আন্দোলন থামে নাই, পরন্তু তাহা বাড়িয়াছে। এবং ক্রমশঃ তাহা লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

আমি হয়তো আগামীকাল চোখ বুজিব কিন্তু আপনাদেরই মধ্যে কোনও একজনকে আমার স্থান পূরণ করার জন্য আগাইয়া আসিতে হইবে। তিনিও যদি গত হন, তাহা হইলে আর একজনকে তাঁহার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ভারতবাসীর ইহা একটি পবিত্র কর্তব্য বিশেষ। উত্তরকালের হিন্দুস্থান তাঁহার জন্য গৌরব অনুভব করিবে।

এই মরণ সঙ্কুল মহারণ হইতে আপনি যদি ভাগ্যবশে বাঁচিয়া থাকিতে পারেন তাহা হইলে আপনি বীর বলিয়া পরিচিত হইবেন এবং যদি আপনাকে মৃত্যুবরণ করিতে হয় তাহা হইলে আপনি মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ হইবেন।

—মহানায়ক রাসবিহারী বসু

উপকূল রক্ষী বাহিনীর হাল নিধিরাম সর্দারের মতোই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের তটরক্ষী বাহিনীর ক্ষমতা আর কাজ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে ক্যাগ (কম্প্রট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল)। মুম্বাইতে ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বরের জঙ্গি হানার পর তদন্ত করে জানা যায় হানাদাররা ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানীতে ঢুকেছিল জলপথে। দেশের সমুদ্রতটের দৈর্ঘ্য সাড়ে সাত হাজার কিলোমিটার। ভারতীয় নৌবাহিনীর সঙ্গে কোস্টগার্ড বা উপকূল রক্ষী বাহিনী কাজ করছে এই বিরাট এলাকা পাহারা আর নিরাপত্তার জন্যে। কিন্তু সমুদ্রতট এলাকার নিরাপত্তার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। এবং নেই প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও সেনা। জঙ্গিরা বুঝতে পেরেছিল উপকূল রক্ষার ক্ষেত্রে ফাঁক আছে। তার সুযোগে ওই পথ দিয়ে তারা ঢুকে পড়েছিল ভারতের মাটিতে। পাহারার মধ্যে দায়সারা ভাব থাকার ফলে এরকম ঘটার সম্ভাবনা— বিশেষজ্ঞদের এমনই অনুমান।

ক্যাগ-এর প্রতিবেদন প্রস্তুত হয়েছে অবস্থা বিশ্লেষণ করে। ক'দিন আগে সেই প্রতিবেদন পেশ করা হয় সংসদে। উপকূল রক্ষী বাহিনীর কাজকর্ম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল আট বছর আগে ২০০৪ সালে। এতগুলো বছর পার হয়েছে। কিন্তু ওই ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা বাহিনীর অবস্থা অনেকটাই নিধিরাম সর্দারের মতো।

একই প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যাচ্ছে, ২০০৮-এ ২৬ নভেম্বরের ঘটনার জন্য দায়ী উপকূল রক্ষী বাহিনী ও সরকার। ফাঁক থেকে যাওয়ায় হামলাকারীরা ঢুকে পড়ার সুযোগ পায়। এরপর সীমান্ত প্রহরা জোরদার না হলে বিপদ আরও বাড়বে। উপকূল এলাকার সমুদ্র অঞ্চল জুড়ে কড়া নজরদারি সহজ কাজ নয়। সেজন্যে অর্থ, অস্ত্র, উপকরণ এবং সেনাবল বাড়ানো দরকার। এ ব্যাপারে কোনওরকম টালবাহানা চলতে পারে না। কারণ বিষয়টি দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। যা হেলাফেলার বিষয় নয়। ঠিকভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার এবং কী ফল মিলছে তাও দেখা চাই।

ক্যাগ-এর বিশেষজ্ঞদের আরও পরামর্শ, সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলে কাজের জন্যে। সীমান্তে উপকূলে যেসব রাজ্য রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ এগোবে। ভারতের সমুদ্রতটের যেসব অঞ্চল থেকে সন্ত্রাস সৃষ্টির ইন্ধন মিলছে এবং অস্ত্র আমদানি হচ্ছে সেদিকে কড়া নজর রাখা দরকার। বেআইনিভাবে অস্ত্র শুধু আসছে না, প্রতিবেশী দেশ থেকে ঢুকছে জঙ্গি-জেহাদি এবং অনুপ্রবেশকারী। সেদিকে নজর যদি না থাকে তাহলে বিপদ আসতেই পারে।

ক্যাগ জানিয়েছে, কোস্ট গার্ডের পক্ষ থেকে ২০০৩ সালে খসড়া বিধিনিয়ম তৈরি করে স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০১০ সাল পর্যন্ত কোনওরকম যোগাযোগ থাকেনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে। যথেষ্ট ফাঁক রয়ে গিয়েছিল কথায় এবং কাজে— এটা ক্যাগ বলতে চেয়েছে। প্রতিবেদনে বলেছে, উপকূল রক্ষার ব্যাপারে কোনওরকম স্পষ্ট নির্দেশ ও পদ্ধতির কথা বলা হয়নি যা অনুসরণ করে উপকূলরক্ষী বাহিনী কাজ করবে।

বর্ডার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ গড়ে ওঠে ২০০২ সালে স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধীনে। এর মূলে ছিল একদল মন্ত্রীর সুপারিশ। সেসময় উপকূল রক্ষী বাহিনীকে বলা হয় উপকূল রক্ষার ব্যাপারে সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত, সুসমন্বয়ে গড়ে ওঠা কর্মসূচী তৈরি করতে। খসড়া রীতি পদ্ধতি তৈরি করে তটরক্ষী বাহিনী পেশ করে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে অনুমোদনের জন্যে ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে। তারপর সেসব ধামাচাপা পড়ে যায়। সাত বছরে উপকূল রক্ষী বাহিনী আর স্বরাষ্ট্র দপ্তর ওই বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি।

প্রসঙ্গত, কারগিল যুদ্ধের পর দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানী সক্রিয় ব্যবস্থা নিয়েছিলেন মন্ত্রিগোষ্ঠীর সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে ১৯৯৯ সালে। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিরক্ষা বাহিনী, গোয়েন্দা দপ্তর, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আমেরিকা 'বাইবেল বর্ষ' পালন করতে পারে আর গীতা স্কুলপাঠ্য হলে ধর্মনিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি কর্ণাটকে এবং তার কিছুদিন আগে মধ্যপ্রদেশ সরকার গীতাকে স্কুলপাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা। তাদের বক্তব্য, তাহলে বাইবেল ও কোরাণকেও স্কুলপাঠ্য করতে হয় যা নাকি অসাংবিধানিক। ঘটনা হলো, এযাবৎ শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, লোকমান্য তিলক, মাহাত্মা গান্ধী, বিনোবা ভাবের মতো রাষ্ট্রনির্মাতারা এবং সাম্প্রতিককালে স্বামী চিন্ময়ানন্দ প্রমুখ সন্ত মহাত্মারা গীতার গুরুত্ব তথা মাহাত্ম্যের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। তাই প্রশ্ন উঠেছে, মধ্যপ্রদেশ ও কর্ণাটক সরকার গীতাকে স্কুল পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে কি সংবিধান বিরোধী কাজ করেছে? গীতা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক। রাজ্যের নবীন প্রজন্মের মানসিকতা ভারতীয় সংস্কৃতির অনুকূলে গড়ে উঠুক— দুই রাজ্যের শাসক দলের এই ভাবনাই তো তাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। গীতা পাঠের মাধ্যমে রাজ্যে সাংস্কৃতিক জাগরণ হোক—এই সদিচ্ছার ফলশ্রুতিই তো এই সিদ্ধান্ত। এই ব্যবস্থায় রাজ্য সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি কি ক্ষুণ্ণ হবে? এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, গত শতাব্দীর আশির দশকে আমেরিকা বাইবেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিল।

মার্কিন জাতির প্রগতির ক্ষেত্রে বাইবেলের প্রভাবের কথা স্বীকার করে আমেরিকার সেনেট সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৮৩ সালকে 'ইয়ার অব দি বাইবেল' হিসাবে ঘোষণা করার জন্য প্রেসিডেন্ট রেগনকে অনুরোধ জানিয়েছিল। ঘটনা হলো, জর্জ ওয়াশিংটন, অ্যান্ড্রু জ্যাকসন, আব্রাহাম লিঙ্কন, উড্রো উইলসন-এর মতো অনেক মার্কিন প্রেসিডেন্টরাই আমেরিকার জনজীবনের উপর বাইবেলের প্রভাব স্বীকার করেছেন। যদি ধর্মনিরপেক্ষ আমেরিকা সরকারীভাবে 'বাইবেল বর্ষ' ঘোষণা করতে পারে তাহলে গীতাকে স্কুলপাঠ্য করার প্রস্তাবে শিবরাজ সিং চৌহান সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে— এই আশংকার কোনও ভিত্তি নেই।

এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে, শ্রেণীকক্ষে গীতা কিভাবে শেখানো ও ব্যাখ্যা করা হবে? শুধু আধ্যাত্মিক ও পরমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে গীতা অধ্যয়ন খুব কাজের কাজ হবে বলে মনে হয় না। কেননা স্কুল ছাত্রদের কাছে তা বেশ কঠিন বলেই বোধ হবে। গীতার শিক্ষা সাহস, ধৈর্য, প্রসন্নতার মতো মূল্যবোধগুলি ব্যক্তিত্ব নির্মাণে নিশ্চিতভাবে সাহায্য করবে।

গীতা স্পষ্টতই ন্যায় ও নীতির পক্ষে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রত্যেক গীতা অনুসরণকারীরাই তাদের কর্মক্ষেত্র তা সে যুদ্ধক্ষেত্রই হোক বা রাষ্ট্র নির্মাণের ক্ষেত্রেই হোক, নিজেদের কর্ম যথার্থ রূপে সম্পন্ন করেছে। বিবেকানন্দের কথা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি না করার জন্যই আমাদের জাতির এই বর্তমান দুরবস্থা। যদি গীতার কর্মযোগকে ঠিক ঠিক ভাবে ছাত্রছাত্রীদের বোঝানো হয়, তবে তা সঠিক পদক্ষেপ বলেই গণ্য হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি গীতার শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগের চেষ্টা করে তবে তা মধ্যপ্রদেশ ও কর্ণাটকের প্রগতির পক্ষে সহায়ক হবে বলেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনে করেন।

দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ ইংরেজ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দশ আগস্ট। স্থান ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন শহরের ক্রয়ডন এলাকা। এক ওষুধ দোকানের উপরের ফ্ল্যাটে দাঙ্গাকারীরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে ফ্ল্যাট। মণিকা বোনের বাড়ি এসেছিলেন। প্রাণ বাঁচাতে ওপরতলা থেকে লাফ। বেঁচে গেলেন ভদ্রমহিলা। নাম মণিকা কঞ্জঙ্ক (Conzlyk)। আকারে ইঙ্গিতে যেটুকু বোঝা গেছে, এমনকী লন্ডনে প্রকাশিত কয়েকটি কাগজের ইন্টারনেট এডিশন থেকেও বেশ কিছু ছবি, ভিডিও ক্লীপিংস থেকে বোঝাই যাচ্ছে— দাঙ্গাকারীরা সংখ্যায় অনেক। লুটপাট করছে কমবয়সী থেকে বেশি বয়সের সবাই। মূলত ইংরেজদের ঘরবাড়ি দোকানপাট লুঠ হচ্ছে। অথচ দাঙ্গা ছড়াতে শুরু করেছে গত ৬ আগস্ট থেকেই। প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন গ্রীষ্মাবকাশ মাঝপথেই শেষ করে ইতালি থেকে ফিরে এসে পার্লামেন্টের জরুরী অধিবেশন ডেকেছেন। গোলমাল যে দু'পক্ষই করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দাঙ্গায় সামিল লোকেরা মিশ্র জনবসতির নয়, বেশির ভাগই অশ্বেতকায় এবং কমবয়সের। অশ্বেত বা সাদা চামড়ার বাইরের বেশির ভাগই কালো-রা চামড়ার এবং এশিয়া ও আফ্রিকার মূল নিবাসী, এবং মুসলমান সমাজভুক্ত। যুবক-তরুণরা ঘরবাড়ি ও মোটরগাড়িতে আগুন লাগাচ্ছে, যা পাচ্ছে লুটপাট করছে। লুটেরাদের পছন্দের জিনিসপত্র হলো—ফ্ল্যাটস্ক্রীন টিভি সেট, মোবাইল ফোন, স্নীকার্স এবং দামী বিলিতি মদ। দাঙ্গাকারীরা কালো মূলগতভাবে ইংল্যান্ডের বাইরের। কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি তাদের কোনওরকম দয়ামায়া নেই। কিছু মহল থেকে বিপথচালিত করার জন্য দাঙ্গাকে স্রেফ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে কোনও কোনও সংবাদপত্র লিখেছে।

প্রায় সাতদিনেও দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যর্থতা এবার বৃটিশ পুলিশের অক্ষমতাকে বেআব্রু করে দিয়েছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সুনাম এখন একেবারে ধুলায় লুটোচ্ছে। লন্ডনের মেয়র বরিস যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। ৯/১১-এর পর আমেরিকা টের পেয়েছিল, এবার ইংল্যান্ড টের পাচ্ছে দাঙ্গা কাকে বলে। ভারতে ইংরেজ শাসকদের মদতে কলকাতা এবং নোয়াখালিতে ৪৬-এর দাঙ্গা অর্থাৎ একতরফা হিন্দুদের কচুকাটা করা হয়েছিল। দাঙ্গার সময়ে বিপন্ন হিন্দুরা কোনও পুলিশের দেখা পায়নি। আবার এবছর ইংল্যান্ডে বাজেটে পুলিশখাতে ব্যয়সংকোচ করা হয়েছে। ওদিকে একটি আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আবার ইউরোপে হামলার হুমকি অনেক আগেই দিয়ে রেখেছে।

কঙ্কালকাণ্ডের কাণ্ডারীর কলঙ্কজনক নৃশংসতা প্রকাশিত হবেই

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

এ-রাজ্যের সিপিএমের একটার পর একটা কেলেঙ্কারী ফাঁস হচ্ছে। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ-এর জামিন বাতিল করে সি আই ডি হেফাজতে দেওয়া হয়েছে। সি আই ডি-এর জেরার খবর সংবাদ-মাধ্যমে যত বেরোবে, জনমনে ততই ঘৃণা এবং রোষ সৃষ্টি হবে। এ কাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বুদ্ধবাবুর সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নীতি, আর তাঁর ঔদ্ধত্যপূর্ণ তাচ্ছিল্য ''ওরা...আমরা...।'' বিরোধীদের গুঁড়িয়ে দেবো'' এর হুমকি। এ-সবের জন্যই সিপিএমের সদ্য সমাপ্ত পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম-কে কার্যত দশদফা নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ একবাক্যে বলেছেন—''পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের এবং পার্টি নেতৃত্বের ব্যর্থতার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে পার্টি তথা বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষতি হয়েছে।'' খবরে প্রকাশ, প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্তমান বিধায়ক আবদুর রেজ্জাক মোল্লা বলেছেন, ''আমরা ৩৪ বছরে অনেক ভুল করেছি, তারই জন্যে আজ আমাদের বিরোধী দলে বসতে হচ্ছে।'' রেজ্জাক মোল্লা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিবাচক কাজেরও প্রশংসা করেছেন।

সিপিএমের সামনে একাধিক সমস্যা। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে লোকসভায় ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে ''ধরি মাছ না-ছুঁই পানি'' গোছের মনোভাব নিয়েছে। এর কারণ ইউপিএ-এর সম্পর্কে নীতি নিয়েও কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে 'বঙ্গজ-কমরেডগণ'। তাঁদের বক্তব্য ইউপিএ সরকার-এর উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের দরুনই কংগ্রেস-তৃণমূল জোট এরাজ্যে ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলেছেন, এর আগেও রাজ্যে কংগ্রেস-তৃণমূল ঐক্য হয়েছিল। কিন্তু তারা ক্ষমতায় আসতে পারেনি। এর কারণ তখন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম হয়নি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বক্তব্য হলো— বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে পরামর্শ দিয়েছিল তা রাজ্য সিপিএম-নেতৃত্ব প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই বক্তব্যকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন পরাজিত সাংসদ হান্নান মোল্লা। হান্নান মোল্লাকে সমর্থন করেছেন নীলোৎপল বসু, তপন সেন এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। এ-রাজ্যের সিপিএম-নেতৃত্ব বিধানসভা নির্বাচনে প্রকাশ কারাত-কে প্রচারে মাত্র একটি জনসভায় বলতে দিয়েছিল। কারণ প্রকাশ কারাত-এর মতের সঙ্গে বিমান-বুদ্ধদেবের মতপার্থক্য। যদিও বৃন্দা কারাত এবং সীতারাম ইয়েচুরি এ-রাজ্যের নেতৃত্বের 'নির্দেশ' অনুযায়ী বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁরাও পলিটব্যুরোর সভায় একথা উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বের সমালোচনা করেছেন। সিপিএমের কেন্দ্রীয় সভায় শুধু পশ্চিমবঙ্গের পার্টি সংগঠনের কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে আলোচনা হয়নি, কেরলের পার্টিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তীব্র হওয়ার জন্য প্রকাশ কারাত তথা পলিটব্যুরোকে দায়ী করেছে। এ সমস্যা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বিঁধেছে।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সামনে কংগ্রেস সম্পর্কে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমস্যা রয়েছে। বিজেপি-এর

সুশান্ত ঘোষ

ইউপিএ সরকার-বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কেও নীতির সমস্যা রয়েছে। সিপিএমের সামনে সবথেকে বড় সমস্যা হলো 'আদর্শগত' দলিল-এর নিষ্পত্তি করা। প্রকাশ কারাতের কথা— ''বর্তমানে এক বিশ্ব, বিশ্বায়ন, বাজার অর্থনীতি— তার রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব এসব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। চিরায়ত মার্কসবাদী বিশ্লেষণে সব সমাধান পাওয়া যাবে না। চীন-এর নীতির মূল্যায়ন করা দরকার। বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয় মুক্তি আন্দোলনই প্রধান দ্বন্দ্ব। পার্টিসভ্যদের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পার্টি সদস্যদের কেবলমাত্র 'নির্বাচনী ফৌজে' পরিণত করার ফলে, প্রশাসন-পুলিশ নির্ভরশীল হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের পার্টি বসে গেছে। এটাই কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমত। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গে নতুনদের নেতৃত্বে আনা হোক। গৌতম দেব, আবদুর রেজ্জাক মোল্লা, রবীন দেব এই মতের সমর্থক। কিন্তু কলকাতার সম্পাদক রঘুনাথ কুশারী এর বিরুদ্ধে। কারণ তাঁর ক্ষমতা শেষ হবে। সিপিএম পার্টি-সম্মেলনে নেতাদের বিদায় হতে পারে। তা রোখার জন্য বিমান-বুদ্ধ নানা কৌশল এবং গোষ্ঠী তৈরি করেছেন। যার ফল আরও মারাত্মক হবে।

এদিকে রাজ্যের ক্ষমতাসীন জোট অর্থাৎ তৃণমূল ও কংগ্রেস জোটের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। কংগ্রেসে-এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এবং ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে যে তৃণমূলী কর্মীরা কংগ্রেসিদের আক্রমণ করছে। এটা তো স্পষ্ট তৃণমূল তো রাজ্যের সকল দলের দোদুল্যমান সভ্যদের নিজেদের দলে এনে অন্য দলে ভাঙন ধরাতে চাইছে।

এছাড়া মমতা নির্দেশিত জমি অধিগ্রহণ নীতির ফলে ১৩টি রেল-প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। উল্লেখ করা যায় রাজ্য সভার তৃণমূলের সদস্য তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন রাজস্বভূমি দপ্তরের কর্তা দেবব্রত ব্যানার্জিও মমতার ভূমিনীতির সমালোচনা করেছেন। মমতা দেবীর জমি-অধিগ্রহণ নীতির দরুন সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং পাওয়ার গ্রীড কর্পোরেশনের কাজ থমকে গেছে! তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, ''আমি আমার বুদ্ধি- বিবেচনা মতো বক্তব্য রাখলুম। মানা-না-মানা তাঁদের ইচ্ছা।'' জমি- অধিগ্রহণ নীতি নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মমতা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হবেই।

দার্জিলিং-এ মোর্চার নেতা বিমল গুরুং এবং রোশন গিরি আবার ফোঁস করেছেন, বলেছেন, ''বনের অধিকার না-পেলে নির্বাচন করতে দেবো না।'' কলকাতা-কে লন্ডন এবং দীঘা-কে সুইজারল্যান্ড করার লক্ষ্যে মমতা ব্যানার্জি কোটি টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা করছেন। এই টাকায় শহরের মধ্যবিত্তদের খুশী করা যাবে। কিন্তু জঙ্গলমহল, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার দরিদ্র জনজাতি-বনবাসীদের জন্য এ টাকা খরচ হলে বামফ্রন্ট সরকারের অপশাসনের বিধানের পথে যেতো না কি?

বনবাসীদের বনের-অধিকার দেওয়াটাও তো দরকার? তা না করা হলে মাওবাদীদের দাপট বাড়বেই। রাজ্যের অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটানোর জন্য মমতা দেবী কেন্দ্রের কাছে অধিক আর্থিক প্যাকেজ দাবি করেছিলেন। কার্যত, প্রণব মুখার্জি অনেকটাই মঞ্জুর করেছেন। রাজ্যে নতুন কর বসতে চলেছে।

এই অবস্থায় মন্ত্রীদের দপ্তর এবং আবাসনে ৮ দফা সাজসজ্জার ব্যবস্থা করে এবং বিধায়কদের মন্ত্রীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করে ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থাটা বেমানান। কারণ অতিবৃষ্টির ফলে রাজ্যের ৭টি জেলা প্লাবিত। আমন চাষ ধ্বংস হয়েছে, তরিতরকারি চাষ-আবাদও নষ্ট হয়েছে। এর ফলে আগামী পূজার মরশুমে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য হবেই। মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হবেই। বামপন্থীরা ব্যঙ্গ করে বলছে, 'ম্যানমেড বন্যা— ম্যানমেড দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। প্রশাসন ব্যর্থ।' আগামীদিনে এর প্রতিফলন দেখা যাবেই।

সুশান্তকে বাঁচাতে আসরে আঁতেল বুদ্ধ

বাংলা ভাষায় একটি বহুল প্রচলিত কথা আছে। চোরের মায়ের বড় গলা। অর্থাৎ অপরাধী পুত্রের রক্ষায় তার মায়ের আক্রমণাত্মক গলাবাজি করা। হ্যাঁ, ঠিক এই কাজটিই করছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-বিমান বসুরা। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর-গড়বেতা এলাকায় পরিকল্পিতভাবে গণহত্যার নারকীয় ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সিপিএম পার্টির প্রায় ৪০ জন সক্রিয় কর্মী গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে যাকে নিয়ে বুদ্ধ-বিমানের বিস্তর মাথাব্যথা তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ। পূর্ব মেদিনীপুরের লক্ষ্মণ শেঠের মতোই তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরের পার্টির 'বাহুবলী' বিধায়ক নেতা। বেতাজ বাদশা। অন্তত একদা ছিলেন। সুশান্ত ঘোষ সহ পার্টির যে সব দাপুটে নেতারা সিপিএমের রাজত্বে গণহত্যায় জড়িত ছিল তাদের বাঁচাতে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এখন আসরে নেমেছেন। অপরাধীদের রক্ষার জন্য গলার শির ফুলিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছেন। অবশ্য তাতে কোনও লাভ নেই। আইন তার পথেই চলবে। বুদ্ধর হুংকারে ভয় পেয়ে দেশের আদালত খুনের আসামীকে নিরপরাধ বলে রেহাই দেবে না। বুদ্ধবাবু একজন সাচ্চা আঁতেল কম্যুনিস্ট। সবই জানেন। তবু চোখ রাঙাচ্ছেন, গলাবাজি করছেন। কারণ, এইভাবেই তাঁরা তিন দশকের বেশি সময় ধরে রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের কণ্ঠরোধ করেছিলেন। যারা প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল তাদের মাটির তলায় কবর দিয়েছিল সুশান্ত ঘোষেরা। আজ তার বিচার চাইলে বুদ্ধবাবুরা ভয় দেখাচ্ছেন। শাসানি দিচ্ছেন। তবে আবার বলছি, ভয় দেখিয়ে চোখ রাঙিয়ে লাভ হবে না। আইন তার পথেই চলবে। পার্টি সমর্থকদের সমাবেশে গলাবাজি না করে বুদ্ধবাবুদের উচিত আদালতে প্রমাণ করা সুশান্ত ঘোষেরা নিরপরাধ। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' নিতেই গণ কবর খুঁড়ে কঙ্কাল বার করছেন।

বামফ্রন্টের রাজত্বে অসংখ্য গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। সেটাই স্বাভাবিক। কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা ধরে রাখতে সারা পৃথিবীতেই গণহত্যাকেই অস্ত্র করেছে। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় স্তালিন লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ রুশ নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। এমনকী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে যুদ্ধবন্দি

গূঢ়পুরুষের

কলম

রুশ সেনারা জার্মানী থেকে স্বদেশে ফিরলে তাদের সাইবেরিয়ায় গণ কবর দেওয়া হয়। স্তালিনের ভয় ছিল যুদ্ধবন্দি সেনারা কম্যুনিস্ট অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। একই চেনা পথে লাল চীনের জনক মাও জে দং হেঁটে ছিলেন। কোরিয়া, কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম যেখানেই কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা দখল করেছে সেখানেই গণহত্যা, গণকবর, গুপ্তহত্যার ঘটনা ঘটেছে অবাধে। রাষ্ট্রশক্তির মদতে। পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্টরা এই রাষ্ট্রশক্তিকেই ব্যবহার করে গণহত্যা চালিয়েছে। প্রকাশ্যে দিনের আলোয় দক্ষিণ কলকাতার ব্যস্ততম বিজন সেতুতে হাজার হাজার মানুষের চোখের সামনে ১৭ জন আনন্দমার্গের সাধুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারলেও রাষ্ট্রশক্তি খুনী অপরাধীদের একজনকেও শাস্তি দেয়নি। নানুর, কেশপুর, গড়বেতা থেকে নন্দীগ্রাম সর্বত্রই মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা গণহত্যা চালিয়েছে। একজন অপরাধীও শাস্তি পায়নি। কেন? বুদ্ধবাবু বলছেন, 'সে সব অনেক পুরানো ঘটনা। অতীতকে খুঁচিয়ে তোলা হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিতে।' বুদ্ধবাবুদের মতো আঁতেল কম্যুনিস্টদের জানা উচিত যে নরহত্যার বিচার ঠিক সময়ে করা হয়নি বলেই খুনীদের পরবর্তীকালে আর বিচার করা যাবে না এমন কথা ভারতের দণ্ডবিধি এবং ফৌজদারি আইনে নেই। বর্ধমানের সাঁইবাড়িতে গণহত্যা থেকে মরিচঝাঁপিতে শতাধিক উদ্বাস্তু পরিবারকে হত্যার ঘটনায় জড়িত খুনীদের বিগত মার্কসবাদী সরকার বিচার করেনি বলেই কোনওদিনই তাদের অপরাধের বিচার হবে না এমন কথা বুদ্ধ-বিমানকে কে বলেছে? বুদ্ধবাবু বলছেন, বিধানসভায় ভাঙচুর করার ঘটনায় তিনি তৃণমূল নেত্রীকে গ্রেফতার করতে পারতেন। কিন্তু বিরোধী দলের প্রতি সৌজন্য দেখিয়ে তিনি সেদিন গ্রেফতার করার নির্দেশ পুলিশকে দেননি। অথচ এখন দশ বছর আগে ঘটে যাওয়া গণহত্যার কবর খুঁড়ে নরকঙ্কাল বার করে সুশান্ত ঘোষেদের ধরা হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দল বিরোধীদের প্রতি রাজনৈতিক সৌজন্য দেখাচ্ছে না। অর্থাৎ, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন সেই পুরানো কবর খুঁড়ে লাভ নেই। চমৎকার যুক্তি। কিন্তু এইসব প্রলাপ বকে সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করা যাবে না। পার্টির তলার সারির কর্মীরা এখন জেনেছেন যে তাঁদের নেতারা (পড়ুন লক্ষ্মণ শেঠ-সুশান্ত ঘোষরা) মাসিক তিন-চার হাজার টাকার হোলটাইমার বৃত্তি করে ১৫০-২০০ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। পার্টির সেই অসাধু নেতা কমরেডদের পিঠের চামড়া বাঁচাতে বুদ্ধবাবুরা যতই গলাবাজি করুন না কেন আখেরে লাভ নেই। পার্টির কর্মীরাই এখন আলিমুদ্দিনের নেতাদের বিশ্বাস করে না।

অভিনন্দন

শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬৪ বৎসরে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে স্বস্তিকার সকল শুভানুধ্যায়ী, বিক্রয় প্রতিনিধি, পাঠক-পাঠিকা ও বিজ্ঞাপনদাতাদের অভিনন্দন জানাই এবং কুশল কামনা করি। আশাকরি, আগামীদিনেও 'স্বস্তিকা' আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা পেতে থাকবে।

—স্বস্তিকা পরিবার

হাইকোর্টের সন্দেহ

এই ধরনের সন্দেহের কথা এতকাল জানিয়ে আসছিলেন বিরোধীরা। এবার সেই একই ধরনের সন্দেহ ব্যক্ত করল দিল্লী হাইকোর্ট। তথ্য জানার অধিকার আইনের আওতার বাইরে তদন্তকারী বিভিন্ন সংস্থা যেমন সেন্ট্রাল ব্যুরো অব্ ইনভেস্টিগেশন (সি বি আই) বা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এন আই এ)-র মতো সংস্থাগুলোকে রাখার যে কারণ কেন্দ্রীয় সরকার দর্শিয়েছে তা যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লী উচ্চ আদালত। বহুদিন ধরেই সংসদে বিরোধীরা অভিযোগ করে আসছেন কেন্দ্র উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবে সি বি আই বা এন আই এ-র মতো সরকারী সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করছে। এই অভিযোগ-কে স্বীকৃতি দিয়ে দিল্লীর উচ্চ আদালত মনে করছে--- গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাজ-কর্মে অবশ্যই স্বচ্ছতা থাকা দরকার। তথ্য জানার অধিকার (আর টি আই) আইনের বাইরে এদের রাখা হলে সেই স্বচ্ছতা আদৌ থাকবে কিনা তা নিয়েই সন্দিহান দিল্লীর হাইকোর্ট। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, আর টি আই আইনে যাতে তাদের সরকারের হয়ে পক্ষপাতমূলক কাজকর্মের জন্য অপদস্থ না হতে হয় সেই কারণেই এই আইনের আওতার বাইরে গোয়েন্দা-সংস্থাগুলোকে রাখার চেষ্টা চলছে কেন্দ্রের তরফে।

বুদগাঁও জমি দখল

জম্মুর বুদগাঁও-এ আই এ এফ স্টেশনের কাছে ২০০ একর জমি বেআইনীভাবে দখল করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলল বিজেপি। একশ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী আধিকারিকের প্রত্যক্ষ মদতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানী'র হাতে সরকারী ওই জমি চলে গিয়েছে বলে অভিযোগ। এর গুরুত্ব বিচার করে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা শঙ্কিত, কারণ এর সুযোগ নিয়ে উগ্রপন্থীরা জম্মুর মাটিকেও দেশবিরোধী কাজে ব্যবহার করতে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা। বিজেপি-র পক্ষ থেকে এই ঘটনায় ক্যাগ (কম্প্রট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল) এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে তদন্তের দাবী জানিয়েছে বিজেপি।

ওসামা-হত্যায় 'বিশ্বাসঘাতক'

ওসামা হত্যায় বিশ্বাসঘাতকটির সন্ধান মিলল এতদিনে। বিশ্বাসঘাতকটি হলেন জনৈক পাকিস্তানী গোয়েন্দা আধিকারিক। যিনি ২৫

মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে আল কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেনের হাল-হকিকৎ সময় মতো মার্কিন-গোয়েন্দাদের যুগিয়েছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। তবে এই 'বিশ্বাসঘাতকতা'র মূল্য যাতে না চোকাতে হয়, তার বন্দোবস্ত আগে থাকতেই পাকা করে রেখেছেন সেই বিশ্বাসঘাতকটি। তিনি ইতিমধ্যেই পাক-মাটি ছেড়ে স্থায়ী আস্থানা গেড়েছেন মার্কিন মাটিতে। এমনকী নিজের ও পরিবারের জন্য মার্কিন নাগরিকত্বও করায়ত্ত করেছেন তিনি।

ঘুষ-ই মুখ্য সমস্যা

এই মুহূর্তে যুব-সমাজ কোন সমস্যাটিকে দেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখছে? দেশের শহুরে যুবকদের কাছে এমনই প্রশ্ন রেখেছিল টাইমস গ্রুপের জনমত সমীক্ষাকারী দল। সেই জনমত সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে যুবসমাজ মনে করছে উৎকোচ গ্রহণ-ই এই মুহূর্তে দেশের প্রধান সমস্যা। ৬৫ তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এই সমীক্ষা নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের মাথাব্যথা বাড়বে। কারণ স্বাধীন ভারতবর্ষের ৬৪ বছরের মধ্যে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে শাসনভার যাদের হাতে ন্যস্ত সেই কংগ্রেসের আমলেই উৎকোচ গ্রহণ রীতিমতো শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। যে ট্র্যাডিশন আমরা এখনও বহন করে চলেছি।

ঋণে জর্জরিত

ঋণের জালে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছে ভারত। সম্প্রতি বিশ্বে সর্বাধিক ঋণগ্রহীতা ২০টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ভারতের স্থান পঞ্চম। যদিও বিশ্বব্যাঙ্কের এই তথ্য উদ্ধৃত করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় লোকসভায় জানিয়েছেন যে এনিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই কারণ ভারত নাকি বৈদেশিক ঋণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের দিন জাতির প্রতি ভাষণে মুদ্রাস্ফীতির বাড়-বাড়ন্তকে যেভাবে দেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে তুলে ধরেছেন মনমোহন সিং তাতে সরকার যে বিষয়টা নিয়ে গভীর উদ্বিগ্ন তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা যে হারে মুদ্রাস্ফীতি প্রতি নিয়ত বাড়ছে, সামাল দিতে অপারগ কেন্দ্র ভবিষ্যতে আর বেশি করে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের পথেও হাঁটতে বাধ্য হবে।

আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সমস্যাগুলোর মোকাবিলা প্রয়োজন

সাধন কুমার পাল

মাওবাদ অধ্যুষিত এলাকায় নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতা নিয়ে স্থানীয় মানুষের অভিযোগের শেষ নেই। ঠিক তেমনি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বি এস এফ-এর তৎপরতা নিয়েও সীমান্তবাসীদের অভিযোগের শেষ নেই। যখন তখন মারধোর করা, মানুষের স্বাভাবিক গতিবিধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, সময়ে অসময়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে চাষবাস ও যাতায়াত নিয়ে নানা রকম বিধি-নিষেধ জারি থেকে শুরু করে কি নেই সেই অভিযোগের তালিকায়!

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে ভারতের পক্ষে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো অবৈধ অনুপ্রবেশ, নাশকতার উদ্দেশ্য নিয়ে মারণাস্ত্রসহ সন্ত্রাসবাদীদের যাতায়াত, চোরাকারবার, গরু পাচার, মাদক ও মানুষ পাচারের মতো ঘটনা।

তবে এই সমস্ত অভিযোগের বিরুদ্ধেও পাল্টা অভিযোগ আছে। যেমন, কেউ বলছে সীমান্তে অবৈধ ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত লোকেরা বি এস এফ-কে ফাঁসিয়ে নিজেদের আড়াল করার জন্য এই সমস্ত অভিযোগ তুলছে। আবার কেউ বলছে চোরা কারবারিরা নির্দোষ গ্রামবাসীদের ঢাল করার জন্যই এরকম ঘটনা ঘটছে।

বি এস এফ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগের শব্দগুলো এতদিন সীমান্তের এপার থেকে ভেসে

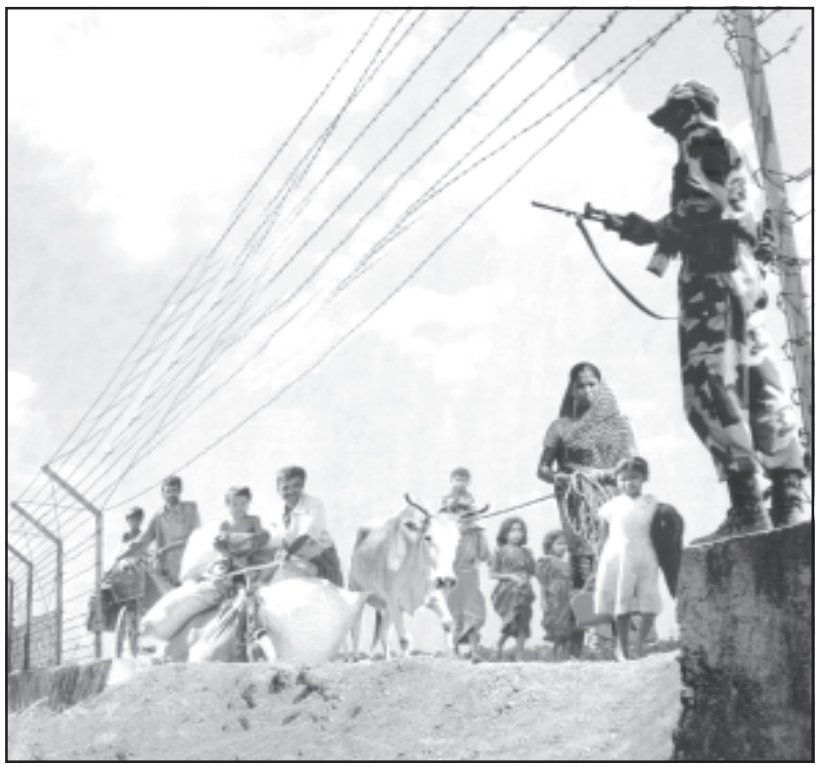

এলেও এবার কিন্তু সেই আওয়াজ শোনা গেল ওপার বাংলার পার্লামেন্টের ভেতর থেকে। বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদন থেকে জানা গেল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইট ওয়াচ' (HRW)-এর যে রিপোর্টটিতে গত দশ বছরে ৯০০ জন বাংলাদেশী নাগরিকের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে সেটি নিয়ে বাংলাদেশ পার্লামেন্টে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা সরব হয়েছেন। এই মৃত্যুর পরিসংখ্যানের সঙ্গে খোদ বি এস এফ-এর দেওয়া তথ্যের আকাশপাতাল ফারাক হলেও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দু'দেশেরই কিছু মানুষ যে সীমান্তরক্ষীদের বন্দুকের নিশানায় পড়ে প্রাণ হারাচ্ছেন এটা সত্য। বলার অপেক্ষা রাখে না মানুষের মৃত্যু মানেই দুঃখের। কিন্তু আজকের দিনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো সীমান্তে সংঘর্ষ, অশান্তি এড়ানোর জন্য ভারতের তরফে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পরও এই সমস্ত অবাঞ্ছিত ঘটনা এড়ানো যাচ্ছে না কেন? এই প্রসঙ্গে আসার আগে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংক্রান্ত কিছু তথ্যের উপর চোখ রাখা যেতে পারে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৪০৯৫ কিমি। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২২১৬ কিমি, ত্রিপুরায় ৮৫৬ কিমি, মেঘালয়ে ৪৪৩ কিমি, মিজোরাম ৩১৮ কিমি এবং অসমে রয়েছে ৩১৮ কিমি সীমান্ত। সীমান্ত রাজ্যগুলোর নাম থেকে এটা পরিষ্কার যে নদী, পাহাড়, লোকালয়, জনশূন্য প্রান্তরসহ বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এলাকা দিয়ে যাওয়া ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রেখা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম জটিল আন্তর্জাতিক সীমান্ত। এর মধ্যে সীমান্ত রেখা ভেদ করে দু'দেশের মধ্যে বইছে ৫৪টি নদী। এই নদীপথগুলোতে সীমান্ত রেখার দৈর্ঘ্য ১.১১৬ কিমি। স্বাভাবিক ভাবেই এই

নদীপথগুলোতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব নয়। এছাড়াও কিছু কিছু এলাকা সম্পর্কে দু'দেশের মধ্যে দাবি-পাল্টা দাবির জন্য ৬.৩ কিমি সীমান্ত এখনও চিহ্নিত করা যায়নি।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে ভারতের পক্ষে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো অবৈধ অনুপ্রবেশ, নাশকতার উদ্দেশ্য নিয়ে মারণাস্ত্রসহ সন্ত্রাসবাদীদের যাতায়াত, চোরাকারবার, গরু পাচার, মাদক ও মানুষ পাচারের মতো ঘটনা। বিশেষ করে বেআইনি অনুপ্রবেশ ভারতের পক্ষে এমনই একটি সমস্যা যে এর ফলে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর জনবিন্যাস পাল্টে যাচ্ছে। তথ্য বলছে আসামের অর্ধশতের বেশী বিধানসভা আসনে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠেছে। আবার অন্যদিকে, বিভিন্ন সময়ে তোলা আপত্তিগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ভারত থেকে মাদক-এর অনুপ্রবেশ বিশেষ করে ফেনশিডিলের অনুপ্রবেশকেই বাংলাদেশ প্রধান সমস্যা বলে মনে করে।

তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত ভারত সরকারের দৃষ্টিতে যতটা গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ সীমান্ত ততটা নয়। কারণ পাকিস্তান সীমান্তে দুর্ভেদ্য কাঁটাতারের বেড়া, থার্মাল ইমেজার সহ নাইট-ভিশন ডিভাইস-এর মতো সীমান্ত পাহারার যত অত্যাধুনিক ব্যবস্থা আছে বাংলাদেশ সীমান্তে তার একাংশও নেই। অবশ্য বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্যই বোধহয় ভারত সরকার এই দেশের সঙ্গে থাকা সীমান্ত নিয়ে এতটা চিন্তিত নয়। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্কের ভিত্তি আরও মজবুত করতে হলে দু-দেশের সীমান্তে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলোকে যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এটা ভাববার বোধহয় সময় হয়েছে। এর জন্য ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের মতো নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করা ছাড়াও নদীপথে থাকা সীমান্ত পাহারার জন্য ভাসমান প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া যে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো বি ও পি (BOP)-র সংখ্যা বাড়িয়ে, অত্যাধুনিক নজরদারী ব্যবস্থা চালু করে, এককথায় শুধুমাত্র বন্দুক দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মতো একটি জটিল সীমান্তকে সামলানো সম্ভব নয়। দেশের মাওবাদী সমস্যা মোকাবিলার মতো ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সুরক্ষা ব্যবস্থার কঠোরতার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। যাতে সীমান্তবাসী হতদরিদ্র মানুষগুলোকে সীমান্তের সংগঠিত অপরাধ চক্রের খপ্পর থেকে মুক্ত করা যায়।

কারণ ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারির সুযোগ নিয়ে মাওবাদীরা যেমন প্রভাব বিস্তার করে, ঠিক একই রকম ভাবে চোরাচালানচক্র সীমান্ত এলাকার মানুষকে খুব সামান্য অর্থের বিনিময়ে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করাতে বাধ্য করে। এর জন্য সীমান্ত এলাকার উন্নয়নের জন্য বর্ডার এরিয়া ডেভল্যপ্‌মেন্ট প্রোগ্রাম-এর (BADP) মতো সীমাবদ্ধ অর্থ বরাদ্দের প্রকল্প তুলে দিয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী বিশেষ অর্থনৈতিক যোজনা তৈরি করা প্রয়োজন।

কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের জমিগুলোতে সীমান্তের কৃষকরা বাংলাদেশী চোরের ভয়ে আলু বা তামাকের মতো অর্থকরী ফসল ফলাতে পারে না, সেচের অভাবে বোরো ধান আবাদ করতে পারে না। আবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে বি এস এফ-এর বিধিনিষেধের জন্য পাট বা ভুট্টা জাতীয় ফসলও ফলাতে পারে না। এর ফলে সীমান্তের কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি বি এস এফ-এর সঙ্গে এদের স্থায়ীভাবে বিরোধ লেগেই থাকে। এই সমস্যার স্থায়ী নিষ্পত্তির জন্য নায্য মূল্যের বিনিময়ে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের সমস্ত জমি সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হতে পারে। এরপর এই সমস্ত জমি সীমান্তের সমস্ত বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য থাকবে এই শর্তে চাষ করতে ইচ্ছুক চাষি বা তার পূর্বতন মালিকদের হাতে দীর্ঘস্থায়ী লিজ বা অন্য কোনও নিয়মে তুলে দিতে পারে।

সীমান্ত এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিভাবে নিশ্ছিদ্র নজরদারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট রূপরেখা তৈরীর জন্য বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া যেতে পারে। যেমন, বি এস এফ-এর কাছার মিজোরাম সীমান্তের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল সঞ্জয় সিং তার কর্মজীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন যে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ঘটে চলা অনুপ্রবেশ বি এস এফ-এর নিয়ম মাফিক টহলদারী দিয়ে বন্ধ করা সম্ভব নয়। এই সমস্যা সমাধান করতে হলে মোট তিন দফায় নজরদারী চালাতে হবে। এই ত্রিস্তরীয় নজরদারী ব্যবস্থার মধ্যে প্রথমটিতে থাকবে বি এস এফ, দ্বিতীয়টিতে থাকবে সীমান্তের থানাগুলোতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকা পুলিশ আর তৃতীয় অর্থাৎ শেষ স্তরটিতে থাকবে স্থানীয় মানুষদের নিয়ে গঠিত বিশেষ সীমান্তরক্ষীবাহিনী। সন্দেহ নেই এরকম ব্যবস্থা চালু হলে একদিকে যেমন স্থানীয় মানুষ হাতে কাজ পাবে অন্যদিকে সীমান্তে কর্মরত নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের কমিউনিকেশন গ্যাপ কমবে।

সীমান্তের সমস্যা নিয়ে শুধুমাত্র দেশের ভেতরে তৎপরতা চালালেই হবে না। সীমান্ত নিয়ে ভারতের মূল উদ্বেগ ও আশঙ্কাগুলো নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বাংলাদেশের সঙ্গেও কথা বলতে হবে। কারণ সে দেশের মাটি থেকে জঙ্গিঘাঁটি ভেঙ্গে দিয়ে আলফা নেতাদের ভারতের হাতে তুলে জঙ্গি সমস্যায় জেরবার ভারতকে বাংলাদেশ যে ভাবে সাহায্য করেছে ঠিক তেমনি অন্যান্য অনেক সমস্যাই ওদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সমাধান করা দুরূহ ব্যাপার। উদাহরণ হিসেবে গরু পাচারের কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশে গো-মাংস শিল্প ও চর্মশিল্পের জন্য গবাদি পশুর এত চাহিদা যে ভারতীয় প্রশাসন আন্তরিক ভাবে প্রয়াস চালিয়েও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গোরুপাচার বন্ধ করতে পারছে না। এক্ষেত্রে ভারতের উদ্বেগের কথা ভেবে বাংলাদেশ সরকার যদি সে দেশের মাটিতে গজিয়ে উঠা বৈধ ও অবৈধ কসাইখানাগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে ভারত থেকে অবৈধ পথে পাচার হওয়া গরুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে বা সেই সমস্ত গরু বাজেয়াপ্ত করে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে তাহলে খুব সহজেই গো-মাফিয়াদের শক্তিশালী চক্র ভেঙ্গে দিয়ে গোরুপাচার বন্ধ করা যেতে পারে।

দু'দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে সীমান্তের স্থানীয় সমস্যাগুলো মিটিয়ে নেওয়ার যে রীতি চালু আছে সেটিকে উভয় দেশের সীমান্তের জেলা প্রশাসন এমন কি থানাস্তর পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে। যেমন সীমান্তবর্তী কোচবিহার জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ওপারের প্রতিবেশী জেলা লালমণীরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের মধ্যে চোরাকারবার, সীমান্ত অপরাধ সংক্রান্ত তথ্যের আদান-প্রদান ও সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের মতো মেশিনারী তৈরি করা যেতে পারে। কোচবিহার জেলায় আটটি সীমান্তবর্তী থানা আছে। এই থানাগুলোর বিপরীতে বাংলাদেশের থানাগুলোর বোঝাপড়া গড়ে তোলা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে মেখলিগঞ্জ, কুচলিবাড়ি, মাথাভাঙ্গা, শীতলকুচি থানার সঙ্গে বাংলাদেশের পাটগ্রাম থানা ও হাতিবান্দা থানার মধ্যে এমন ব্যবস্থা কৌশল তৈরি করা যেতে পারে যাতে এক দেশের অপরাধী অপরাধ করে অন্যদেশে পালিয়ে যেতে না পারে। সবচেয়ে বড় কথা সদিচ্ছা থাকলে বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে নিজ নিজ দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে শুধু সীমান্ত অপরাধ নয় যে কোনও ধরনের অপরাধ চক্রের বা জঙ্গি সমস্যার মোকাবিলা করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

সন্ত্রাসের উৎস সন্ধানে

অতিথি কলম

রাম মাধব

অগণিত সন্ত্রাসের মাঝে হারিয়ে যাবে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসবাদী হামলা—এমনই সংকেত পাওয়া যাচ্ছে এবং মুম্বাইয়ের এই হামলার স্থান হবে কার্পেটের নীচে। আর এইসব অগুনতি হামলায় কোনও পরিণতি হয়নি, দোষীদের শাস্তি তো দূর অস্ত। গত দশকে দেশজুড়ে এমন হামলা অনেক হয়েছে এবং এর মধ্যে তিনটিই ঘটেছে মুম্বাইয়ে। একটা বিষয়ে মিল রয়েছে এবং তা হলো তদন্তকারী সংস্থা কোথাও দোষীদের চিহ্নিত করতে পারেনি। কেবল ব্যতিক্রম সংসদ হামলা এবং ২৬/১১-য় ঘটনা। অন্যত্র তদন্তকারী সংস্থাগুলির কার্যকলাপ ভীষণভাবে ব্যর্থ।

আমাদের রক্ষার ভার যাদের ওপর তাদের কাছ থেকে আমরা কেবল ব্যর্থতার বিষাদ ধ্বনি শুনতে

২০০৩-এর ২৫ আগস্ট গাড়ী বোমায় বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল মুম্বাই, এইসব ঘটনায় প্রাণহানি হয়েছিল নিরপরাধ ৬০ জন মানুষের। ২০০৬-এ শহরতলীর ট্রেনে বোম ধামাকায় মুম্বাইয়ে প্রাণবলি হলো ২০০ জন মানুষের। সন্ত্রাসবাদীরা আবার আঘাত হানলো শহরে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও জঘন্য আঘাত, যা চলল টানা তিনদিন ধরে। প্রাণ নিল ১৫০ জন মানুষের। ১৩/৭-এর হামলা এই ধারাবাহিক হামলার চতুর্থতম।

আমরা সকলেই মুম্বাইয়ের প্রাণচাঞ্চল্যের গুণগ্রাহী, প্রশংসা করি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই এ ধরনের হামলা দেশের অন্যান্য শহরেও সংগঠিত হয়েছে। গত বছরেই পুনেতে এমন হামলা হয়েছে। আহমেদাবাদ, হায়দরাবাদ, জয়পুর, বেঙ্গালুরু, দিল্লি এবং বারাণসী প্রভৃতি দেশের নামী শহরগুলিতে এমন হামলা হয়েছে। এইসব ঘটনাবলীর মধ্যে অন্ততঃ পাই। আমরা হতাশ হয়ে গৃহমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের কণ্ঠে শুনি, মুম্বাইয়ে কোনওরূপ গোয়েন্দা ব্যর্থতা হয়নি। যা শুনে আমরা যারপরনাই স্তম্ভিত। একদিকে উনি স্বীকার করেছেন এই ঘটনায় কোনওরকম আগাম গোয়েন্দা তথ্য ছিল না। আবার একই মঞ্চ থেকে উনি বললেন যে, গোয়েন্দারা ব্যর্থ নয়!

আবার গৃহমন্ত্রীর স্বগতোক্তি, দেশে নিরাপত্তার কোনও খামতি নেই! মারাঠা মুখ্যমন্ত্রী আবার বললেন কী যে, পরিস্থিতির ওপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। মুম্বাইয়ের এ টি এস প্রধান টি ভি চ্যানেলে বিরক্তি উদ্রেককারী ভাঙ্গা রেকর্ড বাজিয়ে গেলেন এই বলে যে, হামলায় ষড়যন্ত্রকারীদের পরিচয় জানা যায়নি।

স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অবাক হবার মতো কিছু নেই যে, শাসকগোষ্ঠী নেতারা ক্ষমাপ্রার্থী আর বিরোধীরা আক্রমণকারী। ক্ষমাপ্রার্থীরা বলে চলেছেন নিরানব্বই শতাংশ সফলতার পিছনে রয়েছে গোয়েন্দা দপ্তরের নিরানব্বই শতাংশ সাফল্য যা অবশ্য ধোপে টেকে না।

৯/১১-র পর আমেরিকাতে কোনও সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়নি। এবৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ৯/১১-র দশম বার্ষিকী উৎযাপন হবে। সারা দুনিয়া জানে যে, জেহাদীদের নাম্বার ওয়ান দুশমন হলো আমেরিকা। বাস্তব যে, এরপরও সে দেশে হামলা ঘটাবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই আমেরিকা ওইসব প্রচেষ্টা কড়া হাতে দমন করেছে।

সর্বশেষ যে ঘটনাটি ঘটেছে তা হলো এক পাকিস্তানি দুষ্কৃতী টাইমস স্কোয়ারে এক বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ী রেখেছিল এবং তা থেকে বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা করে। আরেকটি চেষ্টা চালায় পাকিস্তানি আরেক দুষ্কৃতী এবং সেটা ছিল বেশ বড়সড় নাশকতার প্রয়াস আর তা হলো লন্ডন থেকে আমেরিকায় আগত ট্রান্স-আটলান্টিক উড়ান উড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা। বৃটিশ এজেন্সি সেই প্রচেষ্টাকে কেবল বানচাল-ই করেনি, পুরো গ্যাংটি ধরাও পড়ে।

আমাদের নেতারা বলেন, 'আমেরিকানরা নিয়মিত ইরাক, আফগানিস্তানে তো আক্রান্ত হচ্ছেন'। কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্ত্রাসের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের ওপর আক্রমণকে এঁরা গুলিয়ে ফেলেন। এঁরা আবার ইরাক আফগানকে ভারতের সঙ্গে মিলিয়ে দেন! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এঁরা এদেশে শাসনে নেই। এঁরা যদি ক্ষমতায় থাকতেন তো দেশকে খাদের কিনারায় নিয়ে যেতেন।

এরপরই আসা যাক দায়িত্বজ্ঞানহীন কিছু মানুষের কথায়। মনে হয় এঁদেরকে ধর্তব্যের মধ্যে না আনাই ভাল। দিগ্বিজয় সিং-ই কেবল নন যে যাঁরা পাগলের প্রলাপ বকেন। পাঁচ বছর আগে ২০০৬ সালে আরেক কংগ্রেসী নেতা অর্জুন সিং মনমোহন নেতৃত্বাধীন ক্যাবিনেট মিটিং-এ মুম্বাই সন্ত্রাসবাদী হামলার জন্য সরাসরি আর এস এস-কেই দায়ী করেন। অর্জুন সিংহের অতীত আমরা জানি যে তিনি কট্টর আর এস এস বিরোধী। কিন্তু দিগ্বিজয় সিংহ আরেক কাঠি সরেস।

অবশ্য অর্জুন সিং ক্ষত্রিয় মহাসভার ঘটনায় কোনও বালিকার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেননি অথবা

দিল্লির সদর কার্যালয়ে অসহায় এক তরুণের ওপর কিল-ঘুষি মারেননি, কিংবা পাগলা ষাঁড়ের মতো উজ্জয়িনীতে কিছু যুবকদের দিকে তেড়েফুঁড়ে যাননি যা তাঁর উত্তরসূরী করে দেখিয়েছেন প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের সমক্ষে, মিডিয়ার সামনে। অবশ্য মানুষ এসব বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেন না বরং বয়সের কথা ভেবে তার এমন আচরণকে লোকে পাগলামি বলে উড়িয়েই দেয়।

কিন্তু একটি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যাঁদের লেখা আর বিবৃতি চিন্তার উদ্রেক ঘটায়। এই দলে রয়েছেন সমরবিশারদ, সংবাদ সংস্থার লোকজন কিংবা বিশ্লেষক। এদের অনেকেই জিগির তুলছে অভ্যন্তরীণ জেহাদের অথবা ঘরোয়া সন্ত্রাসবাদের।

এসব কি সত্য? ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের কার্যকলাপকে অন্য পাগলামির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা কি ঠিক হবে? যদি বাইরের সন্ত্রাসবাদীরা স্থানীয় যোগসাজশের সঙ্গে একযোগে হামলা চালায় তবে তা সত্য, কিন্তু আমরা যদি মনে করি সন্ত্রাসবাদের উৎস এই দেশেই সঞ্জাত তবে তা ভুল হবে এবং উল্টে তা সুপরিকল্পিতভাবে শত্রু রাষ্ট্রকেই উৎসাহিত করবে।

এইসব তত্ত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ সওয়াল খাড়া করে দেয় যে, ভারতে সন্ত্রাস নিয়ে অভ্যন্তরে কোনও মতৈক্য নেই। যখন বিশ্ব জুড়ে ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই যারা চালাচ্ছে তাদের মধ্যেও সংশয় জাগছে, যেমন ইউ এস ন্যাশনাল কাউন্টার-টেররইজম-এ বিতর্ক চলছে রীতিমত যে, ভারতের সন্ত্রাস কি দেশজ না বাইরের দেশের মদতপুষ্ট?

এখানেই নির্ভর করছে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্রুটি বিচ্যুতি এবং বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ব্যর্থতা। গত তিন বছরে পি. চিদাম্বরম যেভাবে পরিস্থিতি সামলাচ্ছেন তাতে এজেন্সীগুলির মধ্যে সংশয় তৈরি হচ্ছে, নৈতিকতাবোধের ক্ষতি হচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলায় অবনতি ঘটছে রাজ্যে রাজ্যে এবং এমন আইন গঠন যেখানে রয়েছে পদ্ধতিগত ত্রুটি এবং এদের হাতে এমনসব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা রূপায়ণ করার কোনও পরিকাঠামোই নেই। পুলিশের আধুনিকীকরণে কেবল টাকা ঢাললেই চলবে না, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে যা এখন আদৌ নেই।

এর নীট ফল হলো দুষ্কৃতী চিহ্নিতকরণে ব্যর্থতা। চর্চা হচ্ছে সিমিকে নিয়ে, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, ডেকান মুজাহিদিনের নাম নিয়ে। যারা ২০০৬ সালের মুম্বাই বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত তারা কি দেশজ?

আমাদের দেশে বহু আগে থেকেই ছোট ছোট অসংগঠিত গোষ্ঠী যাদের অস্তিত্ব নিয়ে নানারকম তথ্য রয়েছে, তাদের স্বীকৃতি দেওয়া শুরু হয়েছে। যে কোনও গোয়েন্দা অফিসার মাত্রই বলবেন যে এগুলি হলো কেতাবী কায়দায় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ এবং এই চিহ্নিতকরণে কেবল মুসলমান নয়, হিন্দুদেরও সামিল করা হচ্ছে দেশে সংগঠিত সন্ত্রাসগোষ্ঠী হিসেবে। ডেভিড কোলম্যান এমনই এক ব্যক্তি। মার্কিন মুলুকে জন্মগ্রহণ করা এক পাকিস্তানি যার সমস্ত সত্তা এমনকী নাম পর্যন্ত মার্কিন ঢঙে সেও কিন্তু আই এস আই এজেন্ট।

এইভাবে আমরা কি ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন (আই এম) সিমি ও অন্য সংগঠনকে এর আওতার বাইরে রাখব?

সমস্যা হল এই সংস্থাগুলির পরিচয় এখন ধোঁয়াশাবৃত। এমনকী এক যুগ পরেও আই এম সংস্থাটির সঠিক পরিচয় জানা যায়নি। কেবল ধৃত কিছু সিমি-র সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এই সংস্থার হদিশ মেলে। একদিকে সিমি কয়েক বিশেষ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এবং আই এমের কাজ হলো গণহত্যার মাধ্যমে সন্ত্রাস ছড়ানো। রিয়াজ ভাইকল, মহম্মদ তৌকির, মহম্মদ ফয়জল, আমির রেজা খানদের নাম এই সংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে। কিন্তু কেউই এই সংস্থার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানে না।

যাঁরা দেশীয় সন্ত্রাস নিয়ে শোরগোল তুলছেন তারা স্মরণে রাখবেন যে, এইসব নেতারা প্রায় সকলেই হয় পাকিস্তানে আশ্রিত নয়তো আই এস আই-এর মদতে তারা হয় দুবাই কিংবা নেপালে রয়েছে। আই এম-এর সক্রিয় সদস্যরা আজমগড়ের একটি স্কুল থেকে আসছে; যেখানে তাদের বন্ধু হিসেবে রয়েছে লস্কর-এ-তৈবা, জৈশ-ই-মহম্মদ এবং হুজি।

আমাদের গোয়েন্দা এজেন্সিগুলি প্রায় অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে কারণ এদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য গোয়েন্দাদের হাতে নেই। আর আমাদের স্বঘোষিত নেতারা এ নিয়ে রাজনীতি করে চলেছেন!

আবার সন্ত্রাসবাদীরা আমাদের এই অদক্ষতার জন্য নিশ্চয়ই হাসাহাসি করে— এরা না পারছে ষড়যন্ত্রীদের ধরতে, না পারছে তাদের 'কড়া আইনের' মাধ্যমে শাস্তি দিতে।

এক সমর-বিশারদ এবং সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ ব্রহ্ম চেলানি সম্প্রতি এক নিবন্ধে বলেছেন, ''সবচেয়ে জঘন্য সত্য হলো যে, আন্তর্দেশীয় সন্ত্রাসবাদীরা ভারতকে এক সহজ টার্গেট হিসেবে গণ্য করেন কারণ এরা প্রায় নিখরচায় তাদের অপারেশন চালায় এদেশে।''

শ্রীমদ্‌ভাগবৎ গীতা স্কুলপাঠ্য নয় কেন?

ডঃ প্রীতিমাধব রায়

শ্রীরামপুর কলেজে যখন আই এস সি ক্লাশে ভর্তি হলাম, তখন ১৯৪৬ সাল, অর্থাৎ দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি। শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন করেছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশন, এখনও তাঁদের পরিচালনাতেই আছে। যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হোত তার মধ্যে ছিল বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের কিছু অংশ, অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তার পরীক্ষা হোত না। পড়াতেন স্বয়ং অধ্যক্ষ ডঃ ডি এইচ সি অ্যাঙ্গাস। এক কথায় তাকে দেবতুল্য মানুষ বলা চলে। চিরকুমার এই বিশপ ছাত্রদের পুত্রতুল্য ভালবাসতেন। তাঁর প্রকাণ্ড কোয়ার্টারটি ছাত্রদের জন্য খোলা থাকত, ছাত্রদের সঙ্গে অবাধে ফুটবল খেলতেন তিনি। অনেক দেশীবিদেশী খৃস্টানের মধ্যে যেমন হিন্দু ধর্মকে ছোট করার একটা চেষ্টা দেখা যেত, মাহেশের রথের মেলায় সেই যুগে প্রভু জগন্নাথের নামে যেসব অন্যায় প্রচার করা হোত, তিনি ছিলেন তার ঠিক বিপরীত। লক্ষণীয় এই যে, সেটা বৃটিশ আমল হলেও খৃস্টান ছাত্রদের আমাদেরই মতো আই এস সি পরীক্ষা দিতে হোত। খৃস্টানদের জন্য কোনও পৃথক পাঠক্রম ছিল না, পৃথক ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল না। অথচ, এই স্বাধীন ভারতে মুসলমানদের তুষ্ট করতে মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে, যার উৎপাদন হলো আধুনিক শিক্ষার অনুপযোগী একদল গোঁড়া নাগরিক। অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের বাইবেলের যেসব নীতিবাদী ও শিক্ষামূলক অংশ পড়াতেন, তাতে তিনি খৃস্টধর্ম প্রচারের বা হিন্দুত্বের নিন্দা করার কোনও চেষ্টাই করতেন না।

স্বাধীন ভারতের স্কুল কলেজের শিক্ষাক্রমের মধ্যে বাইবেলের অংশ, হাসান-হোসেনের জীবন ও তাঁদের নিষ্ঠুর হত্যার কথা পড়ানো হয়, কিন্তু কোনও হিন্দু তার প্রতিবাদ করেন বলে জানা নেই।

ছাত্রদের যে স্কুলপাঠ্য শিক্ষাক্রমে নীতিশিক্ষা দেওয়া উচিত তা এখন স্বীকৃত এবং স্কুলের পাঠক্রমের প্রাক্‌মাধ্যমিক স্তরে যে নীতিশিক্ষার বই পড়ানো হয় তার উপরে পরীক্ষাও নেওয়া হয়। তবে সেই পাঠক্রমের মধ্যে কোনও বিশেষ ধর্মের বিশেষ ক্রিয়া-প্রকরণ শিক্ষা দেওয়া হয় না। নীতি শিক্ষার পাঠক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাও সর্বত্র স্বীকৃত, তবে সেই ধর্মীয় পাঠক্রম এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে অন্য ধর্মকে নিন্দা করা হয়েছে, বা কোনও ধর্ম প্রচারকার্যে সহায়তা করা হয়েছে।

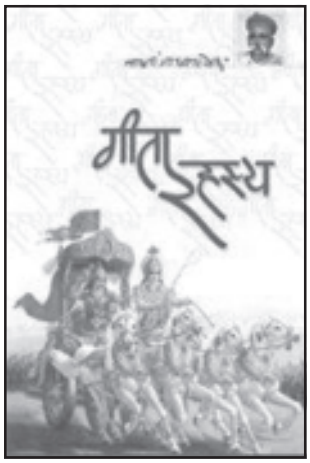

লোকমান্য তিলকের গীতা রহস্য গ্রন্থের প্রচ্ছদ।

নীতি শিক্ষার পাঠক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাও সর্বত্র স্বীকৃত, তবে সেই ধর্মীয় পাঠক্রম এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে অন্য ধর্মকে নিন্দা করা হয়েছে, বা কোনও ধর্ম প্রচারকার্যে সহায়তা করা হয়েছে।

কোনও কোনও রাজ্যে যে ধর্মীয় ও নীতিশিক্ষা পাঠক্রম চালু করা হয়েছে, তাতে শ্রীশ্রীগীতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যে কোনরকম ধর্মসমন্বয়ী চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে গীতা ও উপনিষদকে সর্বোচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। গীতার ধ্যানের মধ্যে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, গীতা সব উপনিষদের সার।

গীতা যে কেবল হিন্দুদের পাঠ্য একখানি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ এই ধারণা একেবারেই ভুল। হিন্দুদের কাছে তো গীতা বর্তমান যুগোপযোগী শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ শুধু তাই নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অসংখ্য নরনারী শ্রদ্ধাভরে গীতা পাঠ করেন। জার্মান মনীষী উইলিয়াম ডন হামবোলট্ বলেছেন, গীতার মতো সুললিত, সত্য ও সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ পদ্যগ্রন্থ সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনও ভাষায় নাই। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি সুপ্রচলিত ভাষায় গীতার অনুবাদ করা হয়েছে। ১৭৮৫ খৃস্টাব্দে গীতার প্রথম ইংরাজী অনুবাদ লন্ডনে মুদ্রিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে রুশভাষায় গীতার অনুবাদ হয়। প্রসিদ্ধ ইংরাজ মনীষী কার্লাইল মার্কিন মনীষীকে একখানি গীতা উপহার দেন। তাঁরা যে এই মহাগ্রন্থ পাঠে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কেবল তাই নয়, তাঁদের রচনাও গীতার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

লোকমান্য তিলক বলেন, গীতার মতো অপূর্বগ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে কেন, জগতের সাহিত্যে দুর্লভ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, উপনিষদ হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুসুমরাজি চয়ন করিয়া গীতারূপ এই সুদৃশ্য মাল্য গ্রথিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বলেন, গীতা মানবের পারমার্থিক জননী। আমার মাতার স্বর্গগমনের পর গীতা তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছে। আমি যখন কোনও সমস্যায় পড়ি, তখনই আমি গীতা মাতার কাছে দৌড়াই। আচার্য বিনোবা ভাবে গীতার যে মারাঠী অনুবাদ করেন, তার নাম দেন গীতাঈ অর্থাৎ গীতামাতা। তিনি কারাবাসকালে সেখানকার নানা ধরনের কয়েদীদের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য তাদের সামনে

গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন। সেই পাঠও কাম্য। 'গীতা প্রবচন' নামে এক লোকপ্রিয় অমূল্য গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। সমগ্র মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি তাঁর গীতা ব্যাখ্যার প্রারম্ভে বলেছেন সকল শাস্ত্রের সার গীতায় নিহিত। বাংলার ভূতপূর্ব গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসের মতে গীতাতত্ত্বই ভারতীয় চিন্তার পূর্ণপরিণতি ও সূক্ষ্মনির্যাস। মোগল সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো লিখেছেন— গীতা স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস। সর্বোচ্চ

গীতা সম্পর্কে সমগ্র জগতের চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের মতামত থেকে এটি স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, গীতা মোটেই একখানি হিন্দু সাম্প্রদায়িক পুস্তক নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার সঠিক মার্গদর্শক। কাজেই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের গীতার শিক্ষাকে সঠিক ও গভীর ভাবে জানা উচিত। গীতার শিক্ষা ভিন্ন মানুষের শিক্ষাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সত্যলাভের সুগম পথ গীতায় প্রদর্শিত। গীতায় পরমপুরুষের কথা বিবৃত ও ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত। গীতা ইহলোক ও পরলোকের সুগভীর এবং শ্রেষ্ঠ রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করে। ইংরাজ মনীষী এল ডি বার্নেট বলেন, জীবনের প্রত্যেক কর্মকে অনাসক্তির অনলে শুদ্ধ করিয়া উপাসনায় পরিণত করার যে অপূর্ব কৌশল গীতা শিক্ষা দেয় তাহা মানবজীবনের অনন্য অবলম্বন। জনৈক ফরাসী তত্ত্বপিপাসু বারো বৎসর গীতাচর্চা করার পর বলেছেন—গীতাকে ধর্মজীবনের চিরসঙ্গী করিলে অন্য কোনও ধর্মগ্রন্থ পাঠের আবশ্যকতা থাকে না।

বৃটিশ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস চার্লস উইলকিন্সকৃত গীতার ইরংাজী অনুবাদ পাঠ করে ভূমিকায় লিখেছেন— গীতা সাহিত্য জগতে এক অভূতপূর্ব বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। গীতাপাঠে শুধু ইংরাজ কেন সমগ্র বিশ্ববাসী উপকৃত হইবেন। গীতা ধর্মের অনুশীলনে মানব-জীবন শান্তিধামে পরিণত হইবে। যদিও ইউরোপের সভ্যতা, ধর্মাচরণ ও নৈতিক ব্যবহার গীতোক্ত শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তথাপি উহা আমাদের ধর্মসাধনে ও নৈতিক কর্তব্য পালনে বিশেষ সহায়ক হইবে। গীতার উপদেশ খৃস্টধর্মের মূলসূত্রগুলির প্রকৃত ও সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলমান আলবেরুনি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তিনি গীতার গভীর মূল্যবান চর্চা লিপিবদ্ধ করেছেন। মোগল সম্রাট আকবরের আদেশে তাঁহার সভাকবি আবুল ফজল ও ফৈজী গীতার দুইটি ফরাসী অনুবাদ করেন। মোগল সম্রাটের আমলে গীতার একটি আরবী তর্জমাও রচিত হয়।

জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী গ্যেটে বলেছেন, তোমাকে সকল কর্ম একসময় ত্যাগ করিতেই হইবে। এই সনাতন সঙ্গীত অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের কর্মে ধ্বনিত হইতেছে— তাঁর কাছে এইটিই গীতার এক প্রধান শিক্ষা। গার্বে, হপকিনস, হোলজম্যান, বেরিডেল কীথ, পলডয়সন, চার্লস জনস্টন প্রমুখ খৃস্টধর্মাবলম্বী মনীষী গীতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। অ্যালডাক্স হাক্সলির মতে গীতা শুধু ভারতীয়দের জন্য নহে, সমগ্র মানবজাতির জন্য উহার স্থায়ী মূল্য আছে। জগতে যে সনাতন দর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার প্রাঞ্জলতম ও পূর্ণতম সংক্ষিপ্তসার গীতায় আছে।

গীতা সম্পর্কে সমগ্র জগতের চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের মতামত থেকে এটি স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, গীতা মোটেই একখানি হিন্দু সাম্প্রদায়িক পুস্তক নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার সঠিক মার্গদর্শক। কাজেই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের গীতার শিক্ষাকে সঠিক ও গভীর ভাবে জানা উচিত। গীতার শিক্ষা ভিন্ন মানুষের শিক্ষাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

গীতা সার্বজনীন ধর্মগ্রন্থ। গীতাশাস্ত্রে কোনও গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা স্থান পায়নি। গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ১১ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলছেন— যে যেভাবে আমার আরাধনা করেন আমি সেই ভাবেই তাকে কৃপা করি। সকল ধর্মপিপাসু আমার পথেই বিচরণ করিতেছে। সপ্তম অধ্যায়ের ২১ সংখ্যক শ্লোকে আছে যাহারা ঈশ্বরের যে কোনওরূপ শ্রদ্ধাপূর্বক অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি তাহাকে সেই মূর্তিতে ভক্তি ও বিশ্বাস প্রদান করি। নবম অধ্যায়ের ২৩ সংখ্যক শ্লোকে আছে যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারাও অবিধিপূর্বক আমারই উপাসনা করে।

ভগবানের অসংখ্য নাম, তার যে কোনও একটি জপ ও ধ্যান করলেই আমাদের মুক্তিলাভ হয়, গীতাতে এই সত্য স্পষ্টত উচ্চারিত।

গীতা মূলত একটি কর্মযোগী গ্রন্থ। সকল কর্ম যে ফলের আশা না করে করা উচিত, আত্মকর্তৃত্ববোধ, অহংবোধ ত্যাগ করে করা উচিত, এটি গীতার একটি প্রধান কথা। এবং এটি মানব মাত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

খৃস্টান, মুসলমানেরা মূর্তি পূজা ও বহু দেবতা পূজার বিরোধী। গীতাতে এমন অনেক উক্তি আছে যেগুলি এই ধরনের মতবাদের ইঙ্গিত দেয়। যেমন, আমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও অব্যক্ত মূর্তি, আমার দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। (গীতা ৯/৩)। অন্য দেবতার ভক্তগণ আমাকে স্বরূপত জানেন না বলিয়া তাঁহারা আবার সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন। (গীতা ৯/২৪) আমার উপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন (গীতা ৯/২৫) গীতার অষ্টাদশ ও শেষ অধ্যায়ে স্পষ্টতই বলা আছে যে, আমি (ভগবত) উপাধিকৃত ভেদবিশিষ্ট এবং স্বরূপত নিরুপাধি, অদ্বিতীয় চৈতন্যমাত্র উত্তমপুরুষ। (গীতা ১৯/৫৫)। স্বভাবত যারা একেশ্বরবাদী ও নিরাকার ঈশ্বরের বিশ্বাসী তাঁরাও এই সত্যের সমর্থক।

শ্রীমদ্ভগবগদ্গীতা মানুষকে কর্তব্য কর্মের জন্য জীবনকে তুচ্ছ করতে শেখায়। দেহ নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর এই গীতামন্ত্রে নির্ভর করে যুগযুগ ধরে ভারতের বীরগণ মরণকে তুচ্ছ করে কর্তব্যকর্মে অগ্রসর হয়েছেন। এই যুগের বৃটিশ বিরোধীরা নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করেছেন এই গীতামন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করে।

সমগ্র মানব জাতির পক্ষে সর্বযুগে গীতা প্রধান মার্গদর্শক, কোনও ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার প্রভাবে, কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায় - উপসম্প্রদায়ের ইচ্ছায় নবীন ভারতের নবীন নাগরিকদের গীতার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না, একথা আজ ঘোষণা করা প্রয়োজন।

ভারতীয় জীবনদর্শন ও নব্য-ভারতীয় সাহেবরা

ডঃ স্বরূপ ঘোষ

পশ্চিমের উদারবাদী চিন্তনে আলোকিত ভারতীয় উচ্চবিত্ত সমাজের একটি অংশ ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল থেকেই ভারতবর্ষীয় জীবন দর্শন থেকে অনেকটা চ্যুত হয়ে পশ্চিম-ঘেঁষা জীবনযাত্রার সঙ্গে ক্রমশ পরিচিত হয়ে ওঠেন। কালের নিয়মে তাঁরাই পশ্চিমের গুণমুগ্ধ ভারতীয় সাহেব হয়ে উঠেছেন। ব্যক্তির অধিকার রয়েছে অশেষ সম্পদ কুক্ষিগত করার এ বিশ্বাস এঁদের হৃদিমন্দিরের গভীরে গ্রথিত। সংসদীয় গণতন্ত্রের ধাঁচাটিকে নিজেদের সুবিধামত ব্যবহার করে এই শ্রেণীভুক্ত মানুষজন যাঁরা সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশ তাঁরা ধনী থেকে ক্রমশ ধনী হয়ে উঠেছেন। এঁরা ধন আহরণ করার পথে সমস্ত অনৈতিকতাকে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে হৃদয়হীনভাবে স্বার্থপরের মতো নিজ সমৃদ্ধিকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। এঁরা নীতি কথা মুখে বলেন, অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত দরিদ্র মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তাঁদের দারিদ্র্যের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে কুটিলতার সঙ্গে আইনি বেড়াজালকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, অর্থের মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থাকে আবিষ্ট করে, ছলে-বলে-কৌশলে ভোটে জিতে রাজনীতিকেও ক্রমশ কলুষিত করে দিয়েছেন।

বৃটিশ শাসকরা দেশত্যাগের সময় পশ্চিম-ঘেঁষা এই নব্য-সাহেবদেরই তাঁদের যোগ্য উত্তরাধিকারী ভেবে তাঁদের হাতেই শাসন দণ্ড দিয়ে যায়। মধ্যপন্থী রাজনৈতিক শক্তি স্বাধীনতার পূর্বে সর্বমতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মঞ্চ হিসাবে স্বীকৃত হলেও স্বাধীনতার পর ক্রমশ পারিবারিক স্বার্থসিদ্ধির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ভারতবর্ষীয় ধারায় বিশ্বাসী রাষ্ট্রবাদী শক্তি তাঁদের স্বাতন্ত্র্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য শ্যামাপ্রসাদের আশীর্বাদধন্য হয়ে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় কংগ্রেস ভেঙ্গে যে কংগ্রেস(ই)-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাই-ই মূল মধ্যপন্থী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। তাই বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসকদল কংগ্রেস(ই) আবার কবে জাতীয় কংগ্রেস হলো দেবতাদেরও বোধহয় তা অজানা। ঐতিহ্যের অংশীদার হতে ভাবের ঘরে ভ্রান্তিবিলাসে ইতিহাস বদলায় কি? ক্ষমতার রাজদম্ভে ও বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমের পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাসকে কিছুদিনের জন্য ভুলিয়ে দিয়ে বা গুলিয়ে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে কিন্তু আম আর আমড়া এক কি? গান্ধীজী, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাধাকৃষ্ণান, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এঁরা কেউ-ই নেহরু বংশের মতো নিরীশ্বরবাদী ও পশ্চিম ঘেঁষা ছিলেন না।

সমাজতান্ত্রিক নীরিশ্বরবাদী-দের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে নেহরু অনেক কাছাকাছি ছিলেন। যারজন্য তাঁর শাসনকালে সারস্বত সাধনার পীঠস্থান-গুলিতে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী-দের লক্ষণীয় প্রতিষ্ঠা ছিল। নেহরু বংশকে বিপদের সময় কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে কমিউনিস্ট শক্তি কখনও সরাসরি কখনও বাঁকাপথে সাহায্য করেছে। নেহরু সারস্বত সাধনায় কমিউনিস্টদের হাত ধরে যে নিরীশ্বরবাদী ধারার সূচনা করেছিল পরবর্তী সময় মধ্যপন্থী শক্তি সেই পথেই এগিয়ে চলেছে। যাঁর ফল হলো বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা ও অন্যান্য ভারতীয় ধর্ম সাহিত্য ও দর্শনে এদের গভীর অরুচি। এগুলি পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত করার পথে এঁদের প্রবল বাধা। যদিও অর্থনৈতিক চিন্তার জগতে নেহরু আবার কমিউনিস্টদের সঙ্গে একমত ছিলেন না। যখন যে পথে নিজের স্বার্থের সুবিধা সেটাই শ্রেয় পথ এবং তাঁবেদার দলদাস বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকার বিক্রীত কলমচির দায়িত্ব তাকে

গুছিয়ে বুঝিয়ে সাজিয়ে ৮০০ থেকে ১০০০ শব্দের মধ্যে প্রবন্ধ লিখে জনগণের মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করা।

দুরাচার বিরোধী আন্দোলনকে দেখবেন পশ্চিমী মধ্যপন্থা ঘেঁষা পত্রিকার নিরপেক্ষতার আড়ালে পক্ষপাতিত্বের পূজারীরা কিরূপে উদয় অস্ত সমালোচনায় জর্জরিত করছে। কিন্তু মূল যে প্রশ্ন স্বাধীনতার পরে এত বিপুল পরিমাণে কালোধন দেশের বাইরে গেল আর যাঁরা সিংহভাগ সময় কেন্দ্রে শাসনে রইলেন তাঁরা সদ্য তোলা তুলসীপাতা গঙ্গাজলে ধোয়া। এ তত্ত্ব খাড়া করা তো শিবেরও অসাধ্য কাজ। তাই নয় কী? দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ও নিরপেক্ষতার মধ্য দিয়ে প্রায় নিষ্ক্রিয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেছে। যে শ্রেণী এইরূপ ব্যবস্থাকে সমর্থন করছে তাঁরা নিজেরা স্বাধীনতা উত্তরকালে এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা সর্বাধিক উপকৃত। তাঁদের ধনসম্পত্তি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে মধ্যপন্থী রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে গোপনে গাঁটছড়া বেঁধে। তাঁরা তো নিজ স্বার্থেই এই মধ্যপন্থী শক্তির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা কামনা করবে। সামনে ধর্মনিরপেক্ষতার কথাটি নিয়ে আসা যাতে প্রান্তিক মধ্যপন্থী শক্তিগুলি মুসলমান ভোটের ভয়ে রাষ্ট্রবাদী শক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে কুণ্ঠাবোধ করে।

শাসক বিরোধী মঞ্চ বিভক্ত থাকলে শাসকের লাভ— এতো শিশুও জানে। তাই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কঠিন প্রয়াস চলেছে।

১৮৩৫ সালে পশ্চিমঘেঁষা ভারতীয় নব্য-সাহেবদের গুরুঠাকুর Lord Macaulay বলেছিলেন, ''I have traveled accross the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such calibre, that I do not think we would ever conquer this country, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native self-culture and they will become what we want them, a truly dominated nation.'' নব্য ভারতীয় সাহেবরা এই দর্শন ও মতের সার্থক প্রকাশ। ভারতীয় জীবন দর্শনের সারস্বরূপ যে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ সেটা তাঁরা জানেন। তাই অধ্যাত্মবাদের উন্মেষ হলে ভারতবাসী স্বাভিমানের মন্ত্রে দীক্ষিত হলে তাঁরা কোথায় যাবেন? সাহেবরা যেভাবে ভারতবর্ষকে শোষণ করেছিল সে ধারায় তাঁরাও সিদ্ধি পাচ্ছেন। সেসব বন্ধ হলে তো অন্ন জল ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-গীতা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ানো যাবে না তার বিরোধিতা করতেই হবে মধ্যপন্থী শক্তিকে।

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মকে ভারতীয় জাতীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে দেখেছিলেন। নব্য-ভারতীয় সাহেবরা ভাবেন ধর্ম ও Religion সমার্থক। আসলে এটি ভ্রান্তি! ভারতীয় জীবনে ধর্ম-ই মূল। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এ ধারাকেই আমরা মান্য করি আবহমানকাল ধরে। অর্থাৎ অর্থ ও কামকেও যে ধর্ম ও মোক্ষ পথের পরিপন্থী ধারায় পরিচালিত করা যায় না গীতায় সেই জীবন দর্শনই শেখায়। নিত্য শুদ্ধতার মধ্য দিয়ে বুদ্ধে স্থিত হতে হবে তাহলেই মুক্ত হওয়া যাবে অর্থ ও কামের মোহবন্ধন থেকে আর মোক্ষ আসবে সে পথেই। সংসারের মধ্যেই সংসারের শেষ দেখতে গিয়ে সংসারই অশেষ হয়ে যাচ্ছে। অশান্তি বাড়ছে। তাই অধ্যাত্মবাদকেই আবার সামনে নিয়ে আসতে হবে। অনেক হয়েছে সাহেব সাজা। সাজতে গিয়ে ভারত দুর্নীতির দুর্বিপাকে নিমজ্জিত হয়েছে। বিবেকানন্দকে বিবেকে ধারণ করে তাঁর বাণীতে জাগাতে হবে অন্তরাত্মাকে। তিনি বলেছিলেন, ''We have seen that our vigour, our strength, may our national life is in our religion. I am not going to discuss now whether it is right or not, whether it is correct or not, whether it is beneficial or not in the long run, to have this vitality in religion, but for good or evil it is there; you cannot get out of it, you have it now and for ever, and you have to stand by it, even if you have not the same faith that I have in our religion. You are bound by it, and if you give it up, you are smashed to pieces. That is the life of our race and that must be strengthened.'' আমাদের ধর্মের সার হলো গীতা। তাই গীতা যদি পাঠ্য বিষয় হয়, কোনও রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার সে পথে অগ্রসর হলে বিবেকানন্দের বাণীকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়। গীতা ভারতীয় জীবন দর্শনের পূর্ণ প্রকাশ। জাতীয় জীবনের হৃৎপিণ্ড।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ''ভারতবর্ষ'' প্রবন্ধে লিখেছেন, ''এখনও বহুল পরিমাণে বর্বরতা পশ্চিমদেশে সভ্যতার নামাবলী পরিয়া বিচরণ করিতেছে বলিয়াই তাহাকে সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপে বরণ করিতে হইবে, আমাদের ধর্মবুদ্ধির এমন ভীরুতা যেন না ঘটে। ইউরোপ আজকাল সত্যযুগকে উদ্ধতভাবে পরিহাস করিতেছে বলিয়া আমরা যেন সত্যযুগের আশা কোনো কালে পরিত্যাগ না করি। আমরা যে পথে চলিয়াছি সে পথের পাথেয় আমাদের নাই—অপমানিত হইয়া আমাদিগকে ফিরিতেই হইবে।...চিরসহিষ্ণু ভারতবর্ষ বাহিরের রাজহাট হইতে তাহার সন্তানদের গৃহ-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিয়া আছে— গৃহে আমাদিগকে ফিরিতেই হইবে, বাইরে আমাদিগকে কেহ আশ্রয় দিবে না এবং ভিক্ষার অন্নে চিরকাল আমাদের পেট ভরিবে না।'' গৃহে প্রত্যাবর্তনের পাথেয় লেখা আছে বেদ-বেদান্ত- উপনিষদে, আছে রামায়ণ-মহাভারতে, আছে গীতায় সে কথা আমরা সকলে জানি। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে, স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক কারণে, ভোট রাজনীতির জটিলতার জন্যে সত্যকে অস্বীকার করে সত্যযুগে ফিরতে পারব কি? গীতা পাঠের বিরোধিতায় স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে। ক্ষণিকের সে আনন্দ মিলিয়ে যাবে। ভারতে মহাওঁঙ্কার ধ্বনি শোনা যাবেই কারণ সেটাই সনাতন সত্য।

পোসওয়াদির মিউজিয়ামে

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কোলাপুরের গাড়গোতি থেকে মহারাষ্ট্রের মাঙ্গলি জেলার পোসওয়াদি— দু'চাকার যানে গেলে ৯০ কিমি-র কাছাকাছি এই রাস্তাটা পেরোতে মোটামুটি ঘণ্টা তিনেকের বেশি সময় লাগার কথা নয়। তবু ভগবান যাদবের লেগেছিল ৫ ঘণ্টারও অনেক বেশি সময়, তার সাইকেলে। ভাবছেন বুঝি শ্রী যাদব নিতান্তই এক বৃদ্ধ লোক? মোটেই না, সে হলো গিয়ে একজন তরতাজা যুবক। তবু তার ঘণ্টা পাঁচেক সময়-ই লেগেছিল, সাইকেলে চড়ে ৯০ কিলোমিটারের ওই মসৃণ পথটা পার হতে। কারণ তার গতি কমিয়ে দিয়েছিল ৩০ কিমি-র ওজনের একটি বাক্স গ্রামোফোন। হাসলেন না কি? বোধ হয় ভেবে নিয়েছেন বর্তমান সি ডি কিংবা ডি ভি ডি প্লেয়ারের যুগে ওই গন্ধমাদন মার্কা গ্রামোফোনটি কোন হোমে বা কোন যজ্ঞে লাগবে? আরে বাবা মিউজিয়ামে কি সিডি কিংবা ডি ভি ডি প্লেয়ার রাখবেন না কি?

নিজের মিউজিয়ামে ভগবান যাদব।

পোসওয়াদি বলে একটি অজ্ঞাতকুলশীল স্থানে 'মিউজিয়াম' শব্দটা বিস্ময়কর লাগতে পারে বৈ কি। সে মহারাষ্ট্রই হোক বা অন্য কোনও রাজ্য সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার অথবা বেসরকারী উদ্যোগ— কার আর দায় পড়েছে বলুন ওই ধ্যাড় ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে মিউজিয়াম করার? তবে ভগবান যাদবের কথাটা আলাদা। আজ থেকে প্রায় বছর এগারো আগে ২০০০ সালে আচমকাই এক ভদ্রলোক, নাম রাহুল টিংগ্রী, নিবাস খানাপুর, তাঁর ৩০ কেজি ওজনের গ্রামোফোনটি দান করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন ভগবানের কাছে। এর পরেরটা আক্ষরিক অর্থেই ইতিহাস। ৯০ কিমি পথ পেরিয়ে সাইকেলে জিনিসটা বয়ে আনার পর দিন কয়েক বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে গিয়েছিল সে। তারপরে নিজের উদ্যোগেই সে গড়ে তোলার চেষ্টা করে একটি সংগ্রহশালা, যার পোশাকী নাম মিউজিয়াম। এও এক ধরনের বেসরকারী উদ্যোগ-ই বটে! কিন্তু ভগবান যাদব তো আর কোনও উদ্যোগপতি নন, তাঁর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকাও নেই। তাই স্রেফ ভালবাসার জোরেই অজ জায়গা পোসওয়াদিতেই গড়ে তুলেছেন নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা।

এই সংগ্রহশালার আয়তন জানেন তো? মাত্র ৮ ফুট বাই ১০ ফুট, মানে ছোট মাপের ঘর আর কি! তা বলে অবহেলার কোনও স্থান নেই কিন্তু। এই ছোট্ট ঘরের স্থান করে নিয়েছে বহু দুর্লভ সামগ্রী। যেমন চার-চাকার চক্র এবং একটি খাপখোলা বহু প্রাচীন তলোয়ার। এই শেষোক্ত জিনিসটি শ্রী যাদবকে নিজের সংগ্রহ থেকে দিয়েছেন তাঁর মাঙ্গলি জেলারই এক ব্যক্তি। চার চাকা চক্রটি তাঁকে দিয়েছেন সেই রাহুল টিংগ্রী। পোসওয়াদির সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মিউজিয়ামে সংগ্রহের সংখ্যাটা চূড়ান্ত বিস্মিত করার মতোই। প্রায় ১২ হাজার দুর্লভ সংগ্রহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ৬০০ বছরেরও প্রাচীন টপগোলা (অর্থাৎ কি না কামানের গোলা। এই দুর্মূল্য সংগ্রহটি আদতে পোসওয়াদি-র বাসিন্দা সাহাবুদ্দিন বাপু তামবোলির)। এছাড়াও দুর্লভ জিনিসগুলির মধ্যে রয়েছে ১৮৫০-এর সময়কার দ্রাক্ষারস পেষাইয়ের যন্ত্র (যার পেছনে সযত্নে ওই সালটি মুদ্রিত রয়েছে), চোদ্দশ' শতাব্দীর মুদ্রা ও এখনও কাজ করার অবস্থায় থাকা একটি ধ্রুপদী সিনেমা প্রোজেক্টর। আরও আছে, যেমন শতাব্দী প্রাচীন লণ্ঠন, তালা, তলোয়ার, ঘড়ি, ক্যামেরা, ১২৫০টির মতো পারফিউমের বোতল, বৃটিশ আমলের কালিদানি (ইঙ্ক পট), টাইপ রাইটার, প্রোজেক্টর, পানের ডিবে— কি নেই তাতে?

স্থানীয় ব্যাঙ্কের কর্মী শ্রী যাদব ১৯৯৫ সালে তৈরি করেন তাঁর এই শখের মিউজিয়ামটি। ৩০ কেজির বক্স গ্রামোফোনটি জোগাড় করার পর এটিই হয়ে ওঠে তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। স্বল্প পুঁজির সীমাবদ্ধতা নিয়েই তিল তিল করে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর সাধের এই সংগ্রহশালা। যা দেখে রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বেশ বড় একটি জায়গা মিউজিয়ামের জন্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বয়ং পঞ্চায়েত প্রধান। ছেলেটি সৎ, আন্তরিক, পরিশ্রমী— এসবের বাইরেও সংগ্রহশালার প্রতি সত্যিকারের নিষ্ঠা দেখে বহু মানুষ তাঁদের সংগ্রহে থাকা বহু দুর্লভ জিনিস নিশ্চিন্তে দান করে অকৃত্রিম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ভগবান যাদবের দিকে। তাই আজ ভগবান যাদবের বাড়ির ৮ বাই ১০ ফুটের একটি ছোট্ট ঘর দেশের বহু বিখ্যাত মিউজিয়ামের ঈর্ষার পাত্র হয়ে ওঠার ক্ষমতা রেখেছে।

অসমে 'ডি' ভোটার ও বাঙালি হিন্দুদের ভবিষ্যৎ

বাসুদেব পাল।। অসমে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে ২,৭৯,৫১৮টি মামলা বকেয়া। ঝুলে রয়েছে দীর্ঘদিন যাবৎ। এদের 'নাগরিকত্ব' নিয়ে সন্দেহ আছে। সেজন্যই ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে মামলা চলছে। প্রসঙ্গত, এই ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছিল বহু আলোচিত ত্রিপাক্ষিক 'অসম চুক্তি-১৯৮৫' অনুসারে। তিনটি পক্ষ ছিল— কেন্দ্র সরকার (প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী), অসম সরকার (মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত) এবং অসমের অবিসম্বাদিত ছাত্র সংস্থা আসু বা অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন। প্রফুল্ল মহন্ত আসু নেতা হিসেবে স্টুডেন্ট হোস্টেল থেকে একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর আবাসে উঠেছিলেন।

'অসম চুক্তি' সম্পাদনের পর ২৫ বছর পার হয়ে গেছে। যত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি মামলা এখনও ঝুলে রয়েছে। ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও নামের পাশে তকমা জুটেছে 'ডি-ভোটার'। কারণ তাদের নাগরিকত্ব সন্দেহাস্পদ। সেজন্য মামলা চলছে আদালতে। বহু বিতর্কিত ওই 'অসম চুক্তি' অনুসারে ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর পর যারাই বাংলাদেশ বা সাবেক পূর্বপাকিস্তান থেকে অসমে ঢুকে পড়েছেন, বহাল তবিয়তে বিবিধ রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় তারা বসবাস করছেন। আদালত চাইলেই রক্তের সম্পর্কের পরিচয়পত্রও যোগাড় করা বাংলাদেশী মুসলমানদের পক্ষে কোনও কঠিন কাজই নয়। একথা জানিয়েছিলেন শিলচরের একজন আইনজীবী। অথচ হিন্দুরা একাজ করতে পারেন না।

শেষ খবর— ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে ৩১ মার্চ ২০১১ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হওয়া মামলার সংখ্যা ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৭৩টি (দি সেন্টিনেল-২৯/৭/১১)। অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ মুখে বারবার তাগাদা দিচ্ছেন দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করার জন্যে। কিন্তু ব্যবস্থাই যেখানে অপ্রতুল সেখানে কাজ হবে কি করে? ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল-এর ব্যবস্থাপত্র খুবই কম। সাতটি ট্রাইব্যুনালে তো কোনও বিচারকই নেই। বর্তমানে চালু ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা ৩২টি। সরকার আরও চারটি নতুন ট্রাইব্যুনাল তাতে সংযোজন করেছে অতি সম্প্রতি। অথচ ঘটনা হলো সব মিলিয়ে চারটি ট্রাইব্যুনালও ঠিকঠাক কাজ করছে না। সমস্যা রয়েছে বিচারক নিয়োগ নিয়ে। সরকার গুয়াহাটি হাইকোর্টকে ঠিকমতো চাপ দিয়ে ট্রাইব্যুনালে বিচারক নিয়োগ করাতে পারেনি।

১৯৭৮ সালে মঙ্গলদৈ লোকসভার উপনির্বাচনে ভোটার তালিকায় ব্যাপক জনসংখ্যা-বৃদ্ধি ধরা পড়ে। তখনই সর্বসাধারণ অসমবাসী এবং বিশেষত ছাত্রসমাজ বাংলাদেশী বা বিদেশী অনুপ্রবেশ বিষয়ে সচেতন হয়ে তাদের বিতাড়নের দাবীতে পথে নামে। উত্তাল হয়ে ওঠে অসম এবং গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল। যদিও অনেক আগে থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতো জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব অসমবাসীকে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশ বিষয়ে সচেতন করে আসছিলেন। আজ যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী ছিলই।

ছাত্র সংস্থা অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন বা

'আসু'-র নেতৃত্বে কার্ফু অমান্য করে মানুষ রাস্তায় বের হয়। কয়েক বছরের লাগাতার আন্দোলনের ফলে আসু থেকে 'অসম গণপরিষদ' নামে রাজনৈতিক দলের জন্ম এবং পরে তারা ক্ষমতা দখল করে। রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বে অসম চুক্তি এবং ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। সারাদেশে যখন 'বিদেশী অভিবাসন অধিনিয়ম' প্রচলিত তখন কেবলমাত্র অসমে পরিবর্ত হিসেবে 'আই এম ডি টি' আইন চালু। ২০০৩-এ সুপ্রীম কোর্ট ওই বহু বিতর্কিত 'আই এম ডি টি' আইন বাতিল করেন।

প্রাপ্ত সূত্র মতে, অসম আন্দোলনে (বাংলাদেশী বিতাড়ন) রাজ্যের ৮৫৫ জন মানুষ জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। একপ্রান্তে সরকার অন্যপ্রান্তে জননেতারা— কেউই ওইসব ব্যক্তিদের জীবন বলিদানের মূল্য দিতে পারেননি। হয়নি সেইসব শহীদদের স্বপ্নপূরণ। নানা মহল থেকে নানাভাবে প্রশ্রয় পেয়ে বাংলাদেশী মুসলমানরা স্বচ্ছন্দে অসমে বসবাস করছে। এর জাজ্বল্যমান উদাহরণ হলো, বাংলাদেশী কামালুদ্দিনের যমুনামুখ বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া এবং পরে হাইকোর্টের নির্দেশে পুলিশ দিয়ে বহিষ্কার। ততদিনে কামালুদ্দিন অসমে বিয়ে করে জমি-জায়গা কিনে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। পরে জানা যায় সে শুধু বাংলাদেশীই নয়, পাকিস্তান থেকে ভায়া বাংলাদেশ অসমে ঢুকে ভারতীয় বনে গিয়েছিল!

এই প্রসঙ্গে অসম গণপরিষদের বিধানসভার নেতা ও মুখ্য সচেতক (চীপ হুইপ) কেশব মহন্ত-র বক্তব্য— ''অসমে বিদেশী শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া অত্যন্ত শ্লথ। একেবারে শম্বুকগতিতে চলেছে। এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। ১৯৮৫ সালে অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পনেরো বছর কংগ্রেসই রাজ্যের ক্ষমতায় ছিল। এবং চলতি সরকারও পাঁচ বছর রাজ্যের সরকারে আছে ও থাকবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আবার কেন্দ্রেও কংগ্রেসই দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেছে। কংগ্রেস 'অসম চুক্তি' কার্যকর করতে যথেষ্ট সময় পেয়েছিল। সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করা হয়নি। এরকম চললে আগামী কুড়ি বছরেও কোনও কাজ হবে না।''

আসু'র (All Assam Student Union) উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য বলেছেন, ''সোজা কথায় সরকার বিদেশী সমস্যা সমাধানে আদৌ ইচ্ছুক নন, ট্রাইব্যুনালে ২,৭৯,৫১৮টি বিচারাধীন মামলা ঝুলে থাকাই তার প্রমাণ। দেশের অন্যান্য রাজ্যে একজন লোকও যদি বিদেশী বলে চিহ্নিত হয়, তাকে তৎক্ষণাৎ দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু অসমে রয়েছে— ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিলে তবেই কোনও বিদেশীকে বহিষ্কার করা যাবে। যা এক বিলম্বিত দীর্ঘ প্রক্রিয়া। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে রাজ্যের কংগ্রেস সরকার 'ডি' ভোটার এবং ফরেনার্সদের বহাল তবিয়তে রাখতে চায়। আমরা বেশি করে বিচারক নিয়োগ করে দ্রুত বিদেশী সমস্যা সমাধানের জন্য দাবী জানাচ্ছি।''

অসম পাবলিক ওয়ার্কস্-এর চেয়ারম্যান অভিজিৎ শর্মার বক্তব্য, ''অসম রাজ্য সরকারই ট্রাইব্যুনাল বসিয়েছে। বিদেশী সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য রাজ্য সরকারের অসম চুক্তি রূপায়ণ মন্ত্রকও আছে। সরকারের আকাট নির্বুদ্ধিতার জন্য সাতটি ট্রাইব্যুনালে কোনও বিচারকই নেই। ফলে প্রচুর মামলা ঝুলে আছে।'' শ্রী শর্মা জানিয়েছেন, তাঁরা শীঘ্রই নির্বাচন কমিশনারের কাছে 'ডি'-ভোটার নিয়ে ডেপুটেশন দেবেন। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবের জন্যই অসমে বিদেশী বাংলাদেশীতে ভরে গেছে। সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী ও প্রকট হচ্ছে। রাজ্যে জনবসতির ভারসাম্য বদলে যাচ্ছে। সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে ভূমিপুত্র অসমীয়ারাই। ভাগ্যবিড়ম্বিত বাঙালী হিন্দুরা বাংলাদেশে থাকতে না পেরে অসমে ঢুকছে, জুটছে 'ডি' ভোটার-এর তকমা।' সামনে অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

মুসলিমদের নিয়ে সস্তার রাজনীতি শিবু সোরেনের

সংবাদদাতা॥ ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডাকে গত ৪ আগস্ট এক চিঠি লিখেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন। শিবু সোরেনের বক্তব্য, ঝাড়খণ্ড রাজ্য তৈরিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূমিকা থাকলেও আজ পর্যন্ত ওদের জন্য সরকারিভাবে কিছু করা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী কে কোন দলের, তার চাইতে রাজ্যের জন্য সার্বিকভাবে সে কি করছে সেটাই বিচার্য হওয়া উচিত। এদিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্যের ৫৯২টি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতি এবং সহায়তা জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়াও উচ্চ শিক্ষায় মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ, সহায়তা এবং উর্দু ভাষার জন্য স্কুল স্তর থেকে শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্র সংরক্ষণ করা উচিত বলে তিনি জানান।

শিবু সোরেনের এই চিঠি নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে বেশ হৈ-চৈ শুরু হয়েছে। কংগ্রেস মাঝখানে থেকে সরকার পক্ষকে বিপাকে ফেলতে কৌশল করে চলেছে। এক ঢিলে দু'পাখি মারার কৌশল অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের মন জিততে এবং মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডাকে বিপাকে ফেলতে সংবাদমাধ্যমের কাছেও এই চিঠি পরিকল্পনা করে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে ওয়াকিবহালমহল মনে করছেন। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সমস্ত বিষয়ই নির্দিষ্ট কমিটি করে তাদের সুপারিশ অনুযায়ী করা হবে। এ ব্যাপারে সরকারের সহযোগী দল হিসাবে শিবু সোরেন কি মুখ্যমন্ত্রীকে বিপাকে ফেলার উদ্যোগ নিচ্ছেন? এই ব্যাপারে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে শ্রী মুণ্ডা জানান, গুরুজী সরকারের সহযোগী, অভিজ্ঞ এবং রাজ্যের হিতকারী। তার বক্তব্য এবং অভিজ্ঞতা সরকারের কাছে মূল্যবান। তার বক্তব্যকে মাথায় রেখে উর্দুর প্রতি এতদিনের অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত যেমন করা হবে তেমনি সংস্কৃতের প্রতিও যদি সেরকম অবহেলা করা হয়ে থাকে তারও বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যাতে ভাষা নিয়ে কোনও বিরোধ না বাধে।

তবে সবটাই নির্দিষ্ট কমিটির সমীক্ষা ও সুপারিশের ভিত্তিতে হবে বলে শ্রী মুণ্ডা জানান।

ঝাড়খণ্ডে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাচ্ছেন মুণ্ডা সরকার

সংবাদদাতা॥ রাজ্য জুড়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নিল ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সরকার। সরকারি সূত্র অনুসারে রাজ্যের উন্নয়ণের জন্য এবং শিল্পের পরিকাঠামো গড়তে রাজ্যের সর্বস্তরে বিদ্যুৎ পৌঁছনোর জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডার বক্তব্য অনুসারে, ঝাড়খণ্ড রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড-এর মাধ্যমে রাজ্যের ৩২ হাজার গ্রামে যাতে বিদ্যুৎ পৌঁছোয় তার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকেই পরিকল্পনা প্রণয়ন হবে। বিদ্যুৎ বিতরণ এবং শুল্ক সংগ্রহের জন্যও সরকার বিদ্যুৎ বোর্ডের মাধ্যমে পঞ্চায়েত স্তর থেকেই বিতরণ এবং শুল্ক আদায়ের জন্য ফ্রাঞ্চাইজি দেবে।

সূত্র অনুসারে কোনও গ্রামে যদি ১০০ পরিবারের বসবাস থাকে তবে তার জন্য ১০০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বরাদ্দ থাকবে মাস প্রতি। এবং পঞ্চায়েত স্তরেই সম্পূর্ণ শুল্ক আদায়ের কুড়ি প্রতিশত সার্ভিস চার্জ হিসাবে ওই ফ্রাঞ্চাইজিকে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

এই পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ চুরি একদিকে যেমন আটকানো যাবে তেমন অন্যদিকে সুষ্ঠুভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা সাজানো যাবে। তাছাড়াও সরকারি কোষাগারও এর ফলে স্ফীত হবে।

ঝাড়খণ্ডে বাংলা দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা পেতে চলেছে

সংবাদদাতা॥ বাংলা ভাষা দ্বিতীয় রাজ ভাষা হিসাবে মান্যতা পেতে চলেছে ঝাড়খণ্ডে। মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডার বক্তব্য অনুসারে রাজ্য গঠনের পর থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে বহুবার আলোচনা হলেও কার্যকর কিছু হয়নি। এবার সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে বাংলা এবং সাঁওতালী ভাষাকে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজ ভাষার মর্যাদা দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ড রাজ্যে রাঁচীসহ প্রায় সমস্ত জেলাতেই বাঙালীদের বসবাস।

দেশভাগ ও গান্ধীজী

ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বাধীনতার দিনটা সমগ্র ভারতবাসীর কাছে গৌরবের হলেও কিছুটা দুঃখ ও বিষাদেরও। কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ হয়েছে দেশ বিভাজনের মধ্য দিয়ে। আর বর্তমান ভারতমাতার খণ্ডিত রূপকে দেখতে পাওয়ার নেপথ্যে গান্ধীজীর ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। তৎকালীন সময়ে গান্ধীজীর পরোক্ষ সমর্থন যে দেশবিভাগকে ত্বরান্বিত করেছিল তা কয়েকটি তথ্য থেকে প্রমাণ করা যায়। প্রথমে গান্ধীজী দেশবিভাগের বিরোধী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করলেও পরবর্তীক্ষেত্রে তিনি দেশভাগের সমর্থনে সায় দিয়েছিলেন। যখন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে নেহরু ও জিন্না প্রধানমন্ত্রী পদের প্রধান দাবিদার হয়ে ওঠেন তখন তিনি দেশ ভাগের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীকে সংখ্যালঘু তোষণের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর অসহযোগ আন্দোলন মুসলিম মৌলবাদের তুষ্টিকরণ ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া খিলাফতের মতো মৌলবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করে রাজনীতিতে ধর্মান্ধতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন। যা পরোক্ষে দেশ ভাগের চক্রান্তকে মদত দেওয়ার সামিল। তৃতীয়ত, ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলকে পৃথক করার মধ্য দিয়ে জিন্নার হাতে ক্ষমতা প্রদানের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। জিন্নার প্রতি আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লেখা একটি চিঠির ভাষায়—'I have always a friend and servant of you. Please do not disappoint me.' চতুর্থত, তৎকালীন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে দেশবিভাগের প্রস্তাবকে তিনি সমর্থন করেছিলেন এবং তাঁর স্নেহের দুলাল জওহরলাল নেহরুর গদিলাভের পথকে মসৃণ ও ত্বরান্বিত করেছিলেন। সেই সঙ্গে জিন্নার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেছিলেন। তাহলে কি প্রমাণ হয় না যে দেশ ভাগের নেপথ্যে গান্ধীজীর মদত ছিল? পঞ্চমত, ১৯৪২ সালে একটি চিঠিতে প্রকাশ যে তিনি শর্তসাপেক্ষে পাকিস্তান দাবি মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন। সেইসঙ্গে পাকিস্তান দাবি নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাহলে দেশভাগের চিন্তা অনেক আগে থেকেই গান্ধীজীর মনে জেগেছিল। সবশেষে বলা যায় বৃটিশদের সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পায় যখন ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব তথা দেশেভাগের দাবি এবং বৃটিশ সরকার কর্তৃক বিভেদাত্মক চিন্তাধারার মদতদানে গান্ধীজী বৃটিশদের মতলব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হননি। তাছাড়া সুভাষচন্দ্রকে বৃটিশদের

বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের জনগণমন অধিনায়ক রূপে মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। যদিও পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনের এই সার্বিক ব্যর্থতা করুণার উদ্রেক করে। দেশভাগের তীব্র বিরোধী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও কিছু ভুল সিদ্ধান্তের ফলে দেশভাগের দায় তিনি এড়াতে পারেন না।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

হিন্দু নিধনের চক্রান্ত

সম্প্রতি (২৭.৫.২০১১) এক বাংলা দৈনিকে পরিকল্পিতভাবে হিন্দু নিধনের চক্রান্ত—এই মর্মে সংবাদটি প্রকাশিত হয়। এক সপ্তাহ আগে জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদে 'সাম্প্রদায়িক হিংসা প্রতিরোধ বিল' নামক একটি 'অগণতান্ত্রিক এবং বিপজ্জনক সংখ্যালঘু তোষণ' বিলের খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে। এই বিলে ধরে নেওয়া হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে এবং আক্রান্ত হয় সংখ্যালঘুরা। তাই শুধুমাত্র হিন্দুদেরই শাস্তি দিতে হবে। হিন্দুরা আক্রান্ত হলেও মুসলিমরা শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। হিংসা ছড়ালেও মুসলিমরা ছাড় পাবে। এমনকী মুসলমান জঙ্গি সংগঠনগুলিও ছাড় পাবে। পরোক্ষে মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের সন্ত্রাস চালানোর অধিকার দেওয়া হবে।

এ আইন বলবৎ করতে ৭ সদস্যের কমিটি গড়া হবে। কমিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ ৪ জন সদস্যই মুসলিম হবে। এই কমিটি দাঙ্গা হলে তদন্ত করবে, অভিযান চালাবে, সশস্ত্রবাহিনী মোতায়েন করবে, সরকারকে নির্দেশ দেবে এবং দাঙ্গা উপদ্রুত রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করবে। এক কথায় দেশ ভাগের পরেও যারা খণ্ডিত ভারতের বুকে বসে লাগাতার সন্ত্রাস চালাচ্ছে, তাদের হাতেই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বসহ হিন্দু নিধনের আইনি ছাড়পত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে।

কোনও মৌলবাদী ইসলামিক রাষ্ট্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদের খতম করার এমন জঘন্য অমানবিক আইন আছে কিনা জানি না।

গোটা হিন্দু সমাজকে সন্ত্রাসবাদী, দাঙ্গাবাজ অপবাদ দেবার কোনও প্রতিবাদ হবে না? দেশের সৎ নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছে আবেদন এই জঘন্য হিন্দু নিধন বিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।

—অম্বিকা প্রসাদ পাল, ঘোলা বাজার, কলকাতা-১১১।

সুকুমারদা (পাত্র)

সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের প্রচারক সুকুমারদা আর আমাদের মধ্যে নেই। নির্লোভ, স্বল্পাহারী, মিতব্যয়ী ও ধ্যেয়নিষ্ঠ তাঁর জীবনধারা। তারমধ্যে পরম দেশভক্তি— কোনও কিছু না পাওয়ার বিনিময়ে সমাজের কাজ। এ শুদ্ধ আত্মার কাজ, নিরহঙ্কারী পরম্পরাপ্রাপ্ত। দেশের কাজে সঠিক মানসিকতা বা স্থিতি কতটা সহায়ক তার প্রমাণ সুকুমারদা রেখে গেছেন। ঘটনাটা অদ্বৈতদার (সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত) কাছে শুনেই লেখা। বর্ধমান জেলায় মহকুমা প্রচারক থাকাকালীন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছেন। এমন সময় দেখলেন, পথের পার্শ্বে একটি স্থানে অনেক মানুষ হায় হায় গেল গেল রব করছে। সুকুমারদা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, অরক্ষিত পাতকুয়োর মধ্যে একটি গোরুর বাছুর লাফাতে লাফাতে পড়েছে। উনি নিজে কুয়োর পাট ধরে ধরে নিচে নেমে বাছুরটিকে ঘাড়ের উপর নিয়ে উপরে উঠে পড়লেন। কৌতূহলপ্রবণ মানুষ সুকুমারদার পরিচয়, নাম, কোথায় থাকেন, কি করেন, কি খান! সব জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে দিল। উনি বললেন যে আর এস এস সংগঠনে কাজ করেন, ওই মাঠে বিকেলে শাখায় খেলা করেন। পরেরদিন শাখায় গিয়ে দেখলেন অনেক তরুণ-বালক এসে গিয়েছে। সঙ্ঘের কাজ ঈশ্বরের কাজ, কি করে কি হয় কে জানে! নিবাসের ঘটনাটা এরকম— নিবাসে রান্না হচ্ছে, তেল ফুরিয়েছে। সুকুমারদা তেলের শিশিটা তরকারির উপর ঘুরিয়ে দিলেন। বলেন, যাও ভাল তেল হয়েছে, রান্নাও হয়েছে! একসঙ্গে বসে একদিন খাচ্ছি, বাড়িতে বলেছি পায়েস করতে। শেষে পায়েস খেতে গিয়ে দেখি চাল দুধ আলাদা আলাদা। আমার রাগ বেশি দেখে সুকুমারদা বললেন, দুধটাই পায়েস এইরকম মনে করে খেয়ে নিন। ওই দিনের মনের ব্যথা আজও বয়ে বেড়াচ্ছি। নারীর মন দেবতারাও বুঝতে পারেন না বলে প্রবাদ। '৮০ দশকের প্রথম দিকে বহরমপুরে শীত শিবিরে মাননীয় সুদর্শনজীর প্রশ্ন ছিল, বন্ধুত্ব বা সমতা নিয়ে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন উত্তর দিয়েছিলাম। উনি বললেন আপনি

বিবাহিত? আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ। উনি বললেন, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে? মাথা নিচু করে বসে পড়েছিলাম। আমার মনে হয়েছে, এদিক থেকে সুকুমারদা সফলতা লাভ করে গিয়েছেন প্রচারক জীবনে। আমার মনে হয়েছে, উনি বাস্তববাদী ও পরীক্ষিত সত্যকেই যাচাই করে নিতেই পছন্দ করতেন। সুকুমারদারা চিরকাল আছেন, থাকবেন।

—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদা, নদীয়া।

পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন

কিছু পত্র-পত্রিকায় লেখা পড়ে ঠিকই বুঝেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গ নাম পরিবর্তনের একটা চেষ্টা হবেই এবং 'পশ্চিম' কথাটাই হয়তো বাদ যাবে। রাজনীতিকেরা যা করেন তার পিছনে রাজনীতি থাকাই স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গ নাম থাকলে পূর্ববঙ্গ নাম মনে আসা খুব স্বাভাবিক। সুতরাং 'পশ্চিম' শব্দটা না থাকলে পূর্ববঙ্গ নামটাই ধীরে ধীরে ভুলে যাবো। এটাই মনে হয় হবে। ভারতবাসীরা ধীরে ধীরে ভুলে যাবে কোন কোন জমি অতীতে তাঁরা ভোগ করতেন আর এখন সে জমি কারা ভোগ করছে। এই চেতনা থাকলে ভবিষ্যতে আবার তারা যাতে আরও জমি হারিয়ে উদ্বাস্তু না হয় সে বিষয়ে তাদের পক্ষে সতর্ক থাকা খানিকটা সম্ভব। দেশের ভবিষ্যত মনে রেখে আমি আগেও লিখেছি, এ রাজ্যের নাম অপরিবর্তিত থাকুক বা বাংলা অক্ষরে ওয়েস্টবেঙ্গল করা হোক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অতীতে ভারতবাসীরা তাদের অনেক জমিই হারিয়েছেন। অন্যেরা ভোগ করছে। বৌদ্ধদের পূর্বে কাবুলে ব্রাহ্মণ রাজা কালার, সমান্দ, কমলাভ প্রভৃতি সাতজন হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন (Elliot & Dowson, History, Vol. 2, p. 12)। বক্তু-ই-আর খলজির ১২০৪ খৃস্টাব্দ বাংলা দখলের পূর্বে বাংলায় মুসলিম শাসনাধীন হিন্দুরা ব্যাপকভাবে পূর্ববাংলায় মুসলমান হয়ে যান। এই প্রসঙ্গে যে মতবাদের পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালান হয়েছে তা হলো ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ফলেই নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সকলেই এই মতবাদে অন্ধ বিশ্বাসী। ব্যাপক প্রচারেরই ফল। এই অন্ধবিশ্বাস আজও প্রবল। এই ভ্রান্ত প্রচার চালিয়েছে সেই স্বার্থান্বেষীগোষ্ঠী যারা পাকিস্তান দাবী তুলেছিল। ১৮৭২ সালের আদম-সুমারী বাংলার ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার যে মানচিত্র দেখাল তাতে মিথ্যা প্রচারের হাঁড়িটা ফেটে গেল। মানচিত্রে দেখা গেল বাংলার যে যে জেলায় বৈদিক তথা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব বেশি ছিল; যেমন—বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলি প্রভৃতি জেলা, সেখানে হিন্দুরা খুব কমই মুসলমান হয়েছে—০—১০ শতাংশ, ২০—৩০ শতাংশ। অপরদিকে যে যে জেলায় যেমন বগুরা, নোয়াখালি, রঙপুর, দিনাজপুর ইত্যাদি যেখানে বৈদিক তথা ব্রাহ্মণ্যধর্মের খুবই কম প্রভাব ছিল সেখানেই হিন্দুরা খুব বেশি সংখ্যায় ৭০—৮০ শতাংশ এমনকী ৮০—৯০ শতাংশ মুসলমান হয়েছিলেন। সুতরাং যেখানে যেখানে হিন্দুধর্ম বেশি শক্তিশালী ছিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব বেশি ছিল সেখানে খুব কম হিন্দু মুসলমান হয়েছেন। দেখা গেল যে, ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ফলে মুসলমান হওয়ার তত্ত্ব ভ্রান্ত (দেখুন R.M. Eaton, Rise of Islam, Mas no. 5, p. 121)।

যে সত্য খুব কম আলোচিত ও প্রচারিত তা হলো কন্‌ভার্সন বা হিন্দুদের মুসলমান করা বা খৃস্টান করা। এই কর্মকাণ্ড চলমান (on going)। শুরু থেকেই চলছে। এর দ্বারাই পৃথিবীর বেশির ভাগ ভূখণ্ড ভোগ করছেন খৃস্টান ও মুসলমানগণ।

ধর্মান্তর করে করে বাংলার মোট জমির দুই-তৃতীয়াংশ অধিকার করেছেন মুসলমানগণ ১৯৪৭ সালে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ৮২ শতাংশ বাঙ্গালী মুসলমান মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিলেন পাকিস্তান আদায় করতে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ জমি যাতে ১৯৪৭ সালের মতো ভারতবাসীর হাতছাড়া না হয় সেই সচেতনতা থাকুক। ইতিহাস না ভুলানোর জন্যই থাকুক পশ্চিমবঙ্গ নাম।

—ইন্দ্রনাথ সেন ও কৃষ্ণকান্ত সরকার, দমদম পার্ক, কলকাতা-৫৫।

শ্রীরামকৃষ্ণের নামাজ পড়া

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেছেন---মহামানবদের জীবন কেন্দ্র করে বিশ্বের সর্বত্র মিথ গজিয়ে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের নামাজ পড়াটাও একটা মিথ (স্বস্তিকা, ৩০.৫.১১)। সৈয়দ মহাশয়ের বক্তব্য সমর্থন করে 'চিঠিপত্র' বিভাগে দু'খানি পত্রও প্রকাশিত হয়েছে। বারবার ওঠ বোস করে নামাজ পড়া শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে যে সম্ভব ছিল না তা মানতে বাধা নেই।

সৈয়দ মহাশয় বলেছেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে শ্রীম রামকৃষ্ণকে উদ্ধৃত করেছেন 'গোবিন্দ রায়ের কাছে আল্লামন্ত্র নিলাম', শ্রীম-এর এই বাক্যটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, ইসলামে আল্লামন্ত্র বলে কিছু নেই। তা না থাক, তাই বলে উদ্ধৃতিটি অবিশ্বাস করার কোনও অবকাশ নেই। কারণ, শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থাবলীর প্রতিটি ভাগে বলা হয়েছে— ''শ্রীম নিজে সেদিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেইদিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে) সেইগুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diary-তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত''। সুতরাং সৈয়দ মহাশয়ের মন্তব্যটি যে অমূলক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অধিকন্তু, শ্রীম এক সাক্ষাৎকারে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন--- ''আমার গুরুমহারাজের (শ্রীরামকৃষ্ণের) কাছে যা শুনেছি, তা-ই লিখে রেখেছি''--- ('শ্রীরামকৃষ্ণ : নৈঃশব্দ্যের রূপ'— সলিল গঙ্গোপাধ্যায়-কৃত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'Face of Silence 1926'-এর ভাষান্তর)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীম-কথিত কথামৃতে আল্লামন্ত্র 'জপ' বা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া জাতীয় কোনও কথা নেই। অর্থাৎ, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে শ্রীম নিজে যা শোনেননি, সে সকল কথা তিনি 'কথামৃতে' লিপিবদ্ধ করেননি।

—বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০।

চৈতন্য যুগের পরবর্তীকালে নতুন ধারার মন্দির

।। পর্ব — ২।।

ডঃ প্রণব রায়

‘রঘুনাথ বাড়ির’ রঘুনাথের সুদৃশ্য দেউলের এক অংশ এখন ‘খাড়া’ থাকলেও শীঘ্রই এটির ভূপতিত হওয়ার সম্ভাবনা। মেদিনীপুরে গড়বেতার সর্বমঙ্গলা মন্দিরের

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

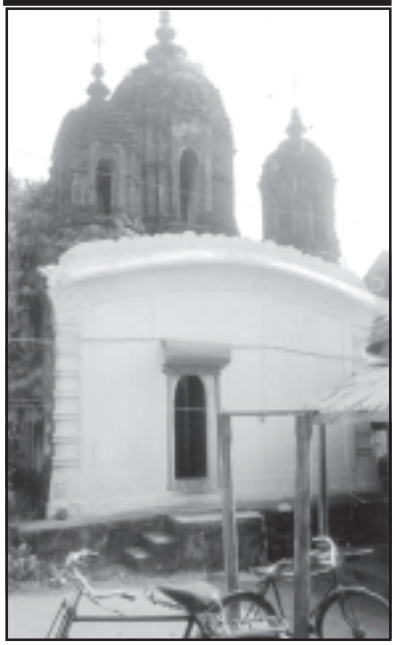

চন্দ্রকোণার ঠাকুরবাড়ি বাজারের ‘পঞ্চরত্ন’ (গুণ্ডিচাবাড়ি)।

কথা বাদ দিলে রঘুনাথজীউর এই দেউলটি ছিল খুবই দর্শনীয়। কিন্তু অবহেলা ও অনাদরের ফলে আজ এটি ধ্বংসের পথে। ওড়িশা ‘রেখ’ দেউলের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই এখানে উপস্থিত। মূল মন্দির-সংলগ্ন ‘জগমোহন’ এখনও বিধ্বস্ত না হলেও শোচনীয় অবস্থায় বর্তমান। মন্দিরের দেববিগ্রহগুলি (ঠাকুরবাড়ি বাজারের ‘পঞ্চরত্ন’ মন্দিরে (‘গুণ্ডিচাবাড়ি’ নামে পরিচিত) দীর্ঘকাল স্থানান্তরিত (আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য)। আগে রঘুনাথজীউর রথ টানা হোত ‘অযোধ্যা’র প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে এবং এই গুণ্ডিচাবাড়িতে এসে রথ থামত। প্রতি বছর বিজয়াদশমীর দিন আজও এখানে রথ হয়। তবে রথ ‘বড় অস্থল’ (রামানুজ ‘শ্রী’-সম্প্রদায়ের মঠ) থেকে আসে। ‘রঘুনাথবাড়ি’ বহুকাল পরিত্যক্ত ও সমাজবিরোধীদের আড্ডাখানা। ‘হেরিটিজ’-কমিশনের এদিকে কোন দৃষ্টি ছিল বলে মনে হয় না।

‘রঘুনাথ বাড়ি’তে আর একটি সুদৃশ্য মন্দির ছিল, সেটি কয়েকবছর আগে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। সেটি ছিল লালজীউর ‘আটচালা’ রীতির মন্দির (আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য)। এরূপ বিশাল ‘আটচালা’ খুব কমই দেখা যায়। মন্দিরটির আগে যে মাপ নেওয়া হয় তা হোল, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যথাক্রমে ৩৬ ফুট ৯ ইঞ্চি (১১.২ মি.) ও ১৯ ফুট ১০ ইঞ্চি (৬.০৫ মি.)। মন্দির সম্পূর্ণ মাকড়া পাথরে নির্মিত ছিল। এর উচ্চতা ছিল প্রায় ৪০ ফুট (১২.২

চন্দ্রকোণার ‘রঘুনাথবাড়ি’র রঘুনাথজীউ বিগ্রহ। ঠাকুরবাড়ি বাজারের গুণ্ডিচাবাড়িতে।

শহর চন্দ্রকোণা লালজীউ-র সুদৃশ্য আটচালা বাড়ির মন্দিরের বর্তমান দৈন্যদশা।

মি.)। কার্ণিশের নীচে ‘স্টাকো’র কিছু মূর্তি-ভাস্কর্য ছিল। এই মন্দিরের বাইরের খোলা বারান্দায় আমরা বহু আগে একটি বড় শিলালিপি দেখেছিলাম। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় ক্লোরাইট পাথরে বাংলা অক্ষরে খোদাই করা এই লিপি থেকে ‘ভান’-রাজ্যের ইতিহাস জানা যায়। এটি একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক লিপি, যা থেকে জানা যায়, রাণী লক্ষ্মণাবতী গিরিধারীলাল জীউর একটি ‘নবরত্ন’ মন্দির ১৫৭৭ শকাব্দ বা ১৬৫৫ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত, মন্দিরটি কিছু দূরে লালগড় এলাকায় ছিল। মন্দির ধ্বংস হয়ে গেলে লিপিটি এই লালজীউ মন্দিরে এনে রাখা হয়। (দ্রষ্টব্য, ‘মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ’/প্রণব রায়, ১৯৮৬, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা-৬৯)। এই অখণ্ড শিলালিপিটি চন্দ্রকোণার ‘ভান’-রাজাদের সম্পর্কিত এক ঐতিহাসিক দলিল। এই মূল্যবান শিলালিপি চন্দ্রকোণার কারও বাড়িতে বা কোনও মঠে রক্ষিত আছে বলে শোনা যায়।

শ্রীচৈতন্যের পদধূলিধন্য গৌড়ের প্রাচীন রামকেলী মেলা

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ ঐতিহাসিক গৌড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন উপলক্ষে মালদার প্রাচীন রামকেলী মেলা আনুমানিক ৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসছে। দেশ-বিদেশ থেকে বহু বৈষ্ণব ভক্ত, সাধু-সন্ত ও সাধারণ মানুষ এই মেলাতে সমবেত হয়। প্রতি বছরের মতো এই বছরেও জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিন (১৫ জুন) থেকে ৭ দিনের জন্য শুরু হয়েছিল এই রামকেলী মেলা। কিন্তু উত্তরবঙ্গের মধ্যে প্রাচীন এবং এত বড় বৈষ্ণব মেলা ও তীর্থস্থান হওয়া সত্ত্বেও হাজার হাজার তীর্থযাত্রীদের জন্য সরকারিভাবে কোনও পরিষেবার ব্যবস্থা থাকে না। তীর্থযাত্রীদের জন্য তিনটি মাত্র যাত্রীনিবাস থাকলেও এত যাত্রী যে এই নিবাসগুলিতে কুলায় না। তাছাড়া শৌচালয়, পানীয় জল, আলো এবং অসুস্থ হয়ে পড়লে অস্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কোনও ব্যবস্থা এখানে নেই।

মেলার প্রথম দিন জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে সবচেয়ে বেশি ভীড় লক্ষ্য করা যায়। তারা এইদিনে খিচুড়ী রান্না করে খায় এবং রাত্রিটা এই রামকেলী তীর্থস্থানেই কাটায়। কোচবিহার, শিলিগুড়ি, অসম ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে হিন্দু তীর্থযাত্রীরা এখানে আসেন। এই বছরেও এসেছেন। বাস ও ট্রেনে করে এইসব যাত্রীদের কষ্ট করে আসতে হয়, বিশেষ ট্রেনের কোনও ব্যবস্থা নেই। বিহারের কাটিহার ও অন্যান্য স্থান থেকে অনেক তীর্থযাত্রীরা রামকেলী তথা গৌড়ের গৌড়েশ্বরী মন্দিরে পিণ্ডদান করতে ভীড় জমায়। তারা তুলসী মন্দিরে (ফিরোজ মিনার) প্রদীপ জ্বালিয়ে আম বাগানের ভিতর দিয়ে গৌড়েশ্বরী মন্দিরে মাতা ও পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করে থাকেন। মালদা জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি এত বড় মেলার জন্য তেমন কোনও পরিষেবার ব্যবস্থা করেনি। মেলাতে আগুন লাগলে দমকলের ব্যবস্থা নেই। যাত্রীদের অভিযোগ তারা জল, থাকার ব্যবস্থা, শৌচালয় পাচ্ছে না। আর বৃষ্টি হলে তো যাত্রীদের দুর্দশার সীমা থাকে না। সংক্রান্তির দিনে যাত্রীরা খোলা আকাশের নীচে থাকতে বাধ্য হয়। অথচ এই মেলাটি যদি সম্প্রদায় বিশেষের হোত তাহলে এখানে এম এল এ, এম পি-দের আনাগোনা বাড়ত এবং যাত্রীদের সব রকমের সুবিধার ব্যবস্থা করা হোত। ভোট বড় বালাই।

সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হয় যখন রামকেলী মেলায় ঘোষেদের গোরুগুলিকে প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। গত ১৫ জুন জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিনে প্রাচীন শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর মন্দির প্রাঙ্গণে বহু ভক্তের উপস্থিতিতে ডঃ তুষারকান্তি ঘোষের লেখা 'শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন, রামকেলী তার বৈষ্ণব সমাজ' বইটির আবরণ উন্মোচন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন যাদবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, মধুসূদন চৌধুরী, বিশ্বনাথ সাহা, সৌমেন্দ্র ঠাকুর, সোমনাথ ঘোষ, জ্যোতিন্দ্রনাথ বর্মন প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীক্ষা গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার পথে রামকেলী গ্রামের তমাল বৃক্ষের তলায় অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় থেকে তার পদচিহ্ন এখানে আছে। এছাড়া আছে তৎকালীন গৌড় সুলতান হোসেন সাহেবের প্রধান আমাত্য সনাতন ও শ্রীরূপ সেবিত মদনমোহন মন্দিরও এখানে রয়েছে। এই ঐতিহ্যবাহী মেলার ও যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার দায়িত্ব সরকারের নেওয়া উচিত বলে মনে করেন স্থানীয় জনসাধারণ।

পাক বিদেশমন্ত্রী হিনা রব্বানি-কে খোলা চিঠি

মাননীয়া
হিনা রববানি খার
বিদেশমন্ত্রী, পাকিস্তান

ক'দিন আগেই আপনি দিল্লি ঘুরে গেলেন। আমরা আপনার এই সফরে খুশি। আশা করি আপনিও খুশি। আপনার রূপ দিয়ে সত্যিই আপনি এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। কিন্তু সত্যিই কি আপনি কিছু জিততে পেরেছেন! আমরা ভারতবাসীরা যে আর আপনাদের মুখের কথায়, চোখের হাসিতে খুশি হতে পারি না। যত বার পাকিস্তান শব্দটা আমাদের কানে আসে তখনই অনেক যন্ত্রণার কথা মনে পড়ে যায়। আসলে আপনাদের থাবা, দাঁত, নখে যে আমরা বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছি।

আপনি যেদিন দিল্লি বিমানবন্দরে নামলেন সেদিন আলোকচিত্রীদের ক্যামেরার ঝলকানি আর থামেই না। আসলে এত কম বয়সের এত রূপসী পাকিস্তানি বিদেশমন্ত্রীকে দেখে থামানো যায়নি তাঁদের। জানেন সত্যিই নীল সালোয়ার আর মুক্তোর মালায় আপনাকে ভারি মানিয়েছিল। কিন্তু আপনার চোখ দুটো ঢাকা ছিল কালো চশমায়। আপনি কি শুরুতেই ভারতীয়দের চোখে চোখ রাখতে ভয় পেয়েছিলেন? আপনার কি তখন মনে পড়েছিল পাক মাটি থেকে উড়ে আসা সন্ত্রাসে বারবার স্বজন হারায় এই ভারত? কিন্তু ভারতের মাটি থেকে তো কোনও প্ররোচনা পৌঁছয় না ইসলামাবাদের মাটিতে!

হিনা জানেন, আপনি যখন ভারতে এলেন তার কদিন পরই ছিল কার্গিল দিবস? হ্যাঁ, জানি সেই দিনটা আপনাদের কাছে লজ্জার দিন। পাক সেনাকে সেদিন ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্বের কাছে হার মানতে হয়েছিল। 'অপারেশন বিজয়' এই দিনেই বিজয় এনে দিয়েছিল ভারতীয় সেনাকে। কার্গিল, দ্রাস, বাতালিক মুক্ত হয়েছিল পাক হানাদারদের হাত থেকে। হিনা, আপনি এখন তেত্রিশ। বারো বছর আগে আপনি তখনও ছাত্রী। রাজনীতিতে আসেননি। ১৯৯৯ এর সেই মার্চে হঠাৎই হানা দিয়েছিল পাক হানাদার। নজরে আসার পর এক মেষ পালক খবর দেন। তারপর ভারতীয় সেনা বাধা দিতে গেলে লেগে গেল যুদ্ধ। হিনা, আপনি হয়তো শুনেছেন গোটা পৃথিবী কাশ্মীরকে বলে 'ভূস্বর্গ'। আর আমরা বলি 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। তাই জন্মভূমির ওই অঙ্গ আমাদের কাছে স্বর্গের চেয়ে মহান। তার ওপর আপনাদের এত লোভ কেন হিনা? আপনি তো ইসলামাবাদের 'নূতন যৌবনের দূত'। পারেন না সেই প্রশ্ন তুলতে? হেরে যেতে হবে জেনেও কেন আপনাদের সিনিয়র শাসকরা একের পর এক যুদ্ধের প্ররোচনা দেন? কেন প্রতিদিন সীমান্তে গোলাগুলি চালানো হয়? কেন সিয়াচিনের গ্লেসিয়ারে এখনও হানাদারদের লোভী চাউনি? ওই প্রত্যন্ত প্রান্তরে শান্তি এলে তো প্রতিবেশী দুই দেশই একটু শান্তিতে থাকতে পারে। প্রতিরক্ষার অনেক খরচ কমিয়ে ফেলা যায়। দু'দেশেই তো সেই অর্থে আসতে পারে অনেক প্রয়োজনীয় উন্নয়ন। দুই মাটিতেই দরকার অনেক উন্নয়নের।

হিনা, আপনার সম্পর্কে অনেক জেনেছি। পাকিস্তানের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী শাহ মহম্মদ কুরেশির বরখাস্তের পর আপনি অ্যাক্টিং ফরেন মিনিস্টারের দায়িত্ব সামলেছেন। আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্টের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির সদস্যা হিসেবে হিনা আপনিই তো প্রথম মহিলা যিনি ২০০৯-এ ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লিতে বাজেট পেশ করেন। আর এখন তো আপনি বিদেশমন্ত্রকের দায়িত্বে। আপনার রাজনৈতিক উত্থান সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু ভারত সম্পর্কে আপনাদের দেশের যে মনোভাব তার কি সত্যিই কোনও পরিবর্তন হয়েছে? এই সময়ের রাজনীতিক হিসেবে পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের ভাব আনতে কি সত্যিই সদর্থক ভূমিকা নিতে পারবেন?

আপনি সেদিন সাদা সালোয়ারে সাদা মুক্তোয় যখন আমাদের বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণার সঙ্গে বৈঠকে বসলেন সেদিন সত্যিই আপনাকে শান্তির দূত বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু এমন বৈঠক দেখতে দেখতে তো আমরা ক্লান্ত। বছরের পর বছর এমন অনেক বৈঠক দু'দেশের মধ্যে হয়েছে। অনেক কূটনৈতিক স্তরের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আপনিই বলুন হিনা সত্যিই কি ভারতের উপর চলা সন্ত্রাস দমনে কোনও ব্যবস্থা নিয়েছে ইসলামাবাদ? আজও আপনাদের দেশের নাগরিক আজমল কাসভরা ছিন্নভিন্ন করে দেয় ভারতের শান্তি।

আপনি দিল্লি আসার কয়েকদিন আগেই ১৩ জুলাই ছিল কাসভের জন্মদিন। আর পাক জঙ্গিরা সেই জন্মদিন পালন করল নিরাপরাধ ভারতবাসীর রক্ত নিয়ে। মুম্বই ব্যস্ত জাভেরি বাজার, অপেরা হাউস, পশ্চিম দাদারে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটালো। হিনা, আপনি তো দুই সন্তানের মা। জানেন সেদিন সন্ধ্যায় বাজার করতে এসে যারা আর বাড়ি ফিরলেন না, তাদের ঘরেও সন্তান আছে। তাদের অপেক্ষা আর কোনও দিনই মিটবে না। ইসলামাবাদের মাটিতে বসে যারা ভারতসহ বিভিন্ন দেশে এইসব সন্ত্রাস চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কি আপনারা ব্যবস্থা নিতে পারেন না? এই সুন্দর পৃথিবীটার স্বার্থে মুখের কথায় নয়, সদিচ্ছা নিয়ে সত্যি করে কি পাকিস্তান একবার রুখে দাঁড়াতে পারে না?

ভারত সফরে এসে এক গোছা রক্ত গোলাপ নিয়ে আপনি যখন প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবাণীর বাড়িতে গিয়েছিলেন তখন সত্যিই ভারি মানিয়েছিল আপনাকে। কিন্তু কে জানি না সেদিন ওই রক্ত গোলাপ দেখে মুম্বইয়ের তাজ হোটেলের সামনে পড়ে থাকা রক্তের কথা মনে হচ্ছিল। মনে পড়ছিল হেমন্ত কারকারের সন্তানদের মুখগুলো। মুম্বইয়ের তাজ হোটেলের সামনে অনেক সাদা পায়রা থাকে। মনে পড়ছিল সেদিনের ভয়ঙ্কর গোলাগুলির সময় কেমনভাবে উড়ে
গিয়েছিল শান্তির প্রতীক সাদা পায়রাগুলো।

মাননীয় হিনা, আর একবার বলছি আপনি তো ইসলামাবাদের নূতন যৌবনের দূত। একবার চেষ্টা করবেন নাকি ইসলামাবাদ যাতে পুরনো ইমেজ ভুলে বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে পা বাড়ায়।

আমরা আপনার সঙ্গে থাকব। ভালো থাকবেন হিনা।

নমস্কারান্তে,
সুন্দর মৌলিক

শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

অমর স্বাধীনতা সংগ্রামী বীণা দাস-ভৌমিক

ইন্দিরা রায়

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৬৪ বছর পূর্ণ হলো ক'দিন আগেই। দীর্ঘ ৬৪ বছরে স্বাধীনোত্তর সময়ের মানব-মানবীদের কাছে প্রাপ্তি এক স্বাধীন জীবন। অনেক সুযোগ-সুবিধা, নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা তারা পেয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজে গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে। আজকের এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে বিপুল লড়াই সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে— সে লড়াইয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে, তাঁরা চির অমর। তাঁদের মধ্যে কিছু মহিলা বিপ্লবী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আজকের প্রতিবেদনে থাকছে তেমনই এক মহান বিপ্লবী মহিলার কথা— তিনি বীণা দাস ভৌমিক। শতবর্ষের সূচনায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

১৯১১-র ২৪ আগস্ট স্বচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আনন্দে ও স্নেহের ছায়ায় পারিবারিক বাতাবরণে বড় হয়ে উঠেছেন বীণা। কিন্তু তাঁর বেড়ে ওঠার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ছিল অগ্নিগর্ভ। চারদিকে তখন চলছে স্বাধীনতা আন্দোলনের নানান কর্মসূচি। বাড়িতেও তার প্রভাব ছিল যথেষ্ট। বাবা ও মেজদা পরোক্ষভাবে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন গান্ধীবাদী। বাবার জীবন দিয়ে উনি শিক্ষা পেলেন যে একটা আদর্শের জন্য মানুষ কত বড় ত্যাগ স্বীকার নিজের জীবনে করতে পারে। মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের আকুল আহ্বান এবং আদর্শবাদী পিতার নিষ্ঠা তার মনে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বুনে দিয়েছিল। তখনই উনি এ পথে আসার প্রতিজ্ঞা করেন।

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে যখন বেথুন কলেজে পড়ছেন, তখন সেখানে এমন দু'জন সহপাঠীর সান্নিধ্য পেলেন যারা ছোট এক বিপ্লবী দলের সভ্যা। ব্যস, দেখে কে! সুহাসিনী দত্ত ও শান্তি দাশগুপ্তের সঙ্গে বিপ্লবী দলে যোগ দিলেন বীণা এবং তারাও খুব খুশি হলেন এমন একজন মহিলাকে পেয়ে। সেই সময়কালটা সম্ভবত ১৯৩০। একদিকে গান্ধীজীর লবণ আইন অমান্য আন্দোলন, আরেকদিকে চলছে তখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। চারদিকে নানা কর্মকাণ্ডের কথা শুনতে শুনতে ছাত্রী বীণা মনে মনে ছবি আঁকতে শুরু করেন, নানা স্বপ্ন তাঁর মনে দানা বাঁধে। ওই বছরেই আগস্ট মাসে ডালহৌসি স্কোয়ারে বাংলার অত্যাচারী

পুলিশ-কমিশনার চার্লস টেগার্টকে বোমা ও রিভলবার দিয়ে আক্রমণ করার অপরাধে গ্রেপ্তার হন দীনেশ মুজমদার এবং নিহত হন অনুজা সেন। এই বোমাকাণ্ডের পর বীণা দাস ও সহপাঠিনীদের বিপ্লবী দলের নেতা কারাবরণ করেন। তখন সমস্ত বাংলাদেশে চলছে স্বাধীনতা সংগ্রাম। বীণা দাস ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিপ্লবীর ভূমিকায় প্রথম থেকেই তিনি দৃঢ় সংকল্প ছিলেন কলকাতা রেসকোর্সে গভর্নরকে গুলি করবার। এ ব্যাপারে তিনি তৎকালীন যুগান্তর কর্মী কমলা দাশগুপ্তের কাছে নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন। পরামর্শে স্থির হয়, কনভোকেশন হলে গভর্নরকে গুলি করা হবে এবং গুলি করার দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে। এবার সেই চরমক্ষণ উপস্থিত হলো। বীণা দাসের জীবনের মরণপণ— সাহেবকে গুলি করা। দিনটি হলো ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। সেনেট হলে কনভোকেশন চলছে। বীণা দাস নিজের আসন থেকে উঠে এসে গভর্নরকে কয়েক হাত দূর থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকেন, কিন্তু গুলি তাঁর কানের পাশ দিয়ে চলে যায়। স্বভাবতই এই ঘটনায় বীণা দাস গ্রেপ্তার হন। কোর্টে তিনি একটি বিবৃতি পেশ করেন। একদিনের বিচারে তাঁকে ন'বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। শক্তিধর গভর্নরকে এক মহিলার গুলি নিক্ষেপের ঘটনা ভূমিকম্পের মতো ফাটল ধরায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্ত ঘাঁটিতে।

এরপর অত্যাচারের নিদর্শন হলো মেদিনীপুর জেলে কারাবন্দী করা। কিন্তু যিনি বিদ্রোহী, প্রতিবাদী তিনি তো অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেনই। তাই তিনি

বন্দী হয়েও সেখানেও অনাচারের প্রতিবাদে অনশন করেন। পরে তাঁকে হিজলি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। অবিভক্ত বাংলাদেশের নানা জেলে স্থানান্তরিত হয়ে ১৯৩৯ সালে গান্ধীজীর রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলনের প্রচেষ্টায় সকল রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে তিনি মুক্তি পান। মুক্তি পাবার পর পরোক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকেন রাজনৈতিক মাসিক পত্রিকার কাজে। শুধু বিপ্লবী কাজেই নয়, সাহিত্য লেখা বিষয়েও আগ্রহী ছিলেন। তিনি সুলেখিকা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মহিলা পরিচালিত 'মন্দিরা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রাক্-স্বাধীনতার মুহূর্তে বীণা দাস আত্মজীবনী লেখেন, 'শৃঙ্খলিত ঝঙ্কার' নামে একটি গ্রন্থ ও 'পিতৃধর্ম' গ্রন্থটি। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বীণা দাস ছিলেন দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের সম্পাদিকা। ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে যে আন্দোলন হয়, সম্ভবত সেটা ছিল শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম। হাজরা পার্কে দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। হঠাৎ ঘোষণা করা হয় এ সভা বেআইনি। ফলে পুলিস এসে ব্যাটন দিয়ে তাঁরই এক সহকর্মীকে মারতে উদ্যত হলে বীণা দাস পুলিস সার্জেন্ট-এর হাত ধরে ফেলেন। তিনি আবার গ্রেপ্তার হন। তিন বছর কারাবাসের পর মুক্ত হয়ে নির্ভীক বীণা বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সমাজসেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল। নোয়াখালির দাঙ্গার পর তিনি সেখানে দাঙ্গাপীড়িতদের মধ্যে সেবাকাজ করতে যান। স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় থাকাকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ কর্মী ও ফরোয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক যতীন ভৌমিকের সঙ্গে পরিচিত হন। কিছুদিন পর একসঙ্গে ঘর বাঁধেন ১৯৪৭ সালে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন নেননি। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেন। এক অর্থে, কখনও থেমে থাকেননি। এমন এক বিপ্লবী নারীর জীবন কাহিনী নারীজাতির গর্ব এবং তিনি চিরনমস্য সর্বজন ও সর্বকালের কাছে। স্বামীর মৃত্যুর পর একাকী জীবন কাটাতে ঋষিকেশে যান, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সংশোধনী

গত ৮ আগষ্ট সংখ্যায় ৩৩ পৃষ্ঠায় 'অঙ্গনা'য় স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষাবিদ ডঃ ফুলরেণু গুহ-কে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন 'সার্ধশতবর্ষ স্মরণে'র পরিবর্তে 'শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য' পড়তে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। — স্বঃ সঃ

কেশবরাও দীক্ষিত সংবর্ধিত

গত ১ আগস্ট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্বাঞ্চলের বরিষ্ঠ প্রচারক তথা স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের ট্রাস্টী কেশবরাও দীক্ষিত-কে (কেশবজী) তাঁর ৮৭তম জন্মদিনে সংবর্ধনা জানানো হলো সিউড়ী সরস্বতী শিশুমন্দির প্রাঙ্গণে, বীরভূম বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ সঙ্ঘের উদ্যোগে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী সত্যানন্দের উপস্থিতি ও তাঁর প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটিকে আরও মাধুর্যময়, ভাবগম্ভীর ও প্রেরণাদায়ী করে তোলে। বিবেকানন্দ শিশুতীর্থের ছাত্রাবাসের ছাত্রছাত্রীরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন সেবা ও শিক্ষা বিকাশ সঙ্ঘের সভাপতি সুরজিত সেনগুপ্ত। সঙ্ঘের প্রবীণ নবীন স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে বিভাগ প্রচারক দেবাশিস অধিকারী ও দক্ষিণ বীরভূম জেলা কার্যবাহ শিবাজী প্রসাদ মণ্ডল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় কেশবজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ছাত্রাবাসের ছাত্রছাত্রীদের আশীর্বচন প্রদান করেন।

রাজ্য রায়ত সংঘের সত্যাগ্রহ

গত ২৯ জুন রাজ্যের অসংগঠিত-অ-সরকারী জনতার পক্ষ থেকে রাজ্য রায়ত সংঘের উদ্যোগে নিম্নলিখিত দাবীর পক্ষে সত্যাগ্রহের সূচনা করা হয়েছে।

সরকারী কর্মচারী শ্রেণীর উচ্চ বেতন ও বিপুল সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে অসংগঠিত ও স্বনিয়োজিত জনতার (রায়ত-দোকানদার-ব্যবসায়ী-কুটির উদ্যোগী-শ্রমজীবী) আর্থিক অবস্থা সমীক্ষা করণের জন্য অবিলম্বে রাজ্য কমিশন গঠন করার দাবী তারা জানিয়েছেন।

এছাড়া বেকার সমস্যা সমাধান ও সরকারী পরিষেবা ব্যাপক প্রসার ও সরকারী পরিকল্পনাগুলির সফলতার জন্যে প্রতি পরিবার থেকে একজন প্যারা-গভঃ-ওয়ার্কার নিয়োগ করার দাবীও জানিয়েছেন।

শোকসংবাদ
পরলোকে মানমল বিয়ানীজী

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা ও হাওড়া মহানগর সমিতির সভাপতি মানমল বিয়ানীজী চলে গেলেন'। মানমল বিয়ানীজী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং সমাজসেবী। গত শতাব্দীর আটের দশকে 'কল্যাণ আশ্রম' শুরুর সময় থেকে তিনি আশ্রমের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও কল্যাণ আশ্রমের বিভিন্ন কার্যক্রমে যোগ দিতেন। নশ্বরদেহ ত্যাগ করার সময় প্রান্ত সমিতির সহ-সভাপতিও ছিলেন। গত ১৫ জুলাই শ্রীগুরু পূর্ণিমার দিন রাত্রিতে নিজ বাসভবনে অমৃতলোকে যাত্রো করেন। ১০ জুলাই ২০১১ নাতির বিয়েতে সকলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কেউ তখন ভাবেনি, 'এদেখাই শেষ দেখা।' তিনি রেখে গিয়েছেন পুত্র-পুত্রবধূ, কন্যা-জামাতা নাতি-নাতনীসহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ কার্যকর্তা।

গত ১৭ জুলাই কল্যাণ ভবনে স্মরণসভার অনুষ্ঠানে আশ্রমের সর্বভারতীয় ক্রীড়া প্রমুখ শক্তিপদ ঠাকুর, ডঃ রামগোপাল গুপ্ত অনেকেই তাঁর স্মৃতিচারণা করেন। তিনি ছিলেন পিতৃতুল্য। সভায় সর্বভারতীয় সভাপতি, সম্পাদক সংগঠন সম্পাদক এবং প্রান্ত সভাপতির শোকবার্তা ও গীতা পাঠ করা হয়।

***

গত ৭ জুলাই হিন্দু মহাসভার একনিষ্ঠ প্রাদেশিক কর্মী শচীন্দ্রনাথ মান্না মহিষাদল থানার চক-দ্বারিবেড়া গ্রামে নিজ বাসভবনে ৭৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই কন্যা ও স্ত্রীকে রেখে গিয়াছেন। হলদিয়া বন্দর প্রকল্পের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণের প্রাক্কালে উদ্বাস্তু ও ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে নজির স্থাপন করে গেছেন।

নবদ্বীপে সংস্কৃত-প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্‌বোধন

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয়-সংস্কৃত সংস্থান (মানিত বিশ্ববিদ্যালয়)-প্রবর্তিত ও নবদ্বীপ সংস্কৃত সমাজ-পরিচালিত অনৌপচারিক ত্রৈমাসিক সংস্কৃত প্রশিক্ষণ শিবিরের তৃতীয়া দীক্ষার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে পণ্ডিত কুমারনাথ ভট্টাচার্য ও বৃন্দাবনধর গোস্বামী।

বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন ক্রীড়াবিদ্ শান্তিময় ভট্টাচার্য, গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও সন্ধ্যারাণী ভট্টাচার্য। কেন্দ্র সংযোজক ডঃ অরুণ কুমার চক্রবর্তী স্বাগত ভাষণ দেন। উপস্থিত ৩০ জন শিক্ষার্থীকে তৃতীয়া দীক্ষার নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক বিতরণ করা হয়।

প্রয়াত সুকুমার পাত্র-র স্মরণ সভা

গত ৩১ জুলাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক সুকুমার পাত্র-র তিরোধানে বীরভূমে সিউড়ী শাখার স্বয়ংসেবকেরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলনিধি

গত ৭ আগস্ট বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর এলাকার স্বয়ংসেবক বিভাস বেজ তাঁর পুত্র ওম্-এর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে স্থানীয় কার্যকর্তা তড়িৎকান্তি রায়ের হাতে হিন্দুত্বের জাগরণের কাজে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন।

‘চীন শক্তিশালী ভারত চায় না’— মানস ঘোষ

বাসুদেব পাল।। ‘‘কেউ তার নিজের প্রতিবেশী বদল করতে পারে না। চীন ও পাকিস্তান ভারতের চিরশত্রু। ১৯৭১-এ ‘বাংলাদেশ’-এর উদ্ভব পাকিস্তান কোনওদিন মেনে নিতে পারেনি। খালেদা জিয়ার আমলে বাংলাদেশ আল কায়েদা ও আই এস আই এজেন্টদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে।’’ গত ৭ আগস্ট কলকাতা প্রেসক্লাবে ‘হিন্দুস্থান সমাচার’ এর কলকাতা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিকতা কর্মশালায় ‘ভারতের প্রতিবেশী দেশ’ বিষয়ে বক্তব্য প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন বাংলা দৈনিক ‘দি স্টেটস্‌ম্যান’ এর সম্পাদক মানস ঘোষ। শ্রী ঘোষ আরও বলেন, পাকিস্তান সেই বদলা নিচ্ছে কাশ্মীরে। লস্কর এ তৈবা, জৈশ এ মহম্মদ প্রভৃতি ইসলামি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন পাকিস্তানী গোয়েন্দা বাহিনী আই এস আই-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে চলেছে। এক ধরনের ‘লো-ইন্টেনসিটি ওয়ার’ চালাচ্ছে। নেপালে রীতিমতো ঘাঁটি গেড়ে আই এস আই ও চীন ভারত বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছে। চীন কখনই চায়না ভারত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হোক। চীনের নজর রয়েছে অরুণাচলের উপর।

মানসবাবু বাংলাদেশ বিষয়ে বলেন, ‘‘১৯৭৫-এ যারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করেছিল তারা ক্ষমতায় বসেই বন্দুকের নলটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল ভারতবর্ষের দিকে। ক্রমশ বাংলাদেশ ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে সক্রিয় বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর অবাধ বিচরণ ও আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। উলফা, এন এস সি এন (আই এম), এন এল এফটি প্রভৃতি উগ্রপন্থী সংগঠন বাংলাদেশকে বেস করে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এবার শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর ভারতের হাতে অনেক সন্ত্রাসবাদী নেতাদেরকে তুলে দিয়েছেন ঝুঁকি নিয়ে। এটা একটা ভালো দিক।’’

এদিন সকাল দশটায় প্রেসক্লাবে স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সাংবাদিকতা বিষয়ক কর্মশালার সূত্রপাত করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং হিন্দুস্থান সমাচারের কলকাতা শাখার প্রধান সম্পাদক রণজিৎ রায়। স্মরণিকা’র আবরণ উন্মোচন করেন ডঃ বাণীপদ সাহা। পরে কর্মশালায় ‘সন্ত্রাসবাদ, বর্তমান সাংবাদিকতা ও ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা’ বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন ওড়িশা পুলিশের প্রাক্তন আই জি ডঃ বাণীপদ সাহা। এছাড়া ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার কমোডর এস ভাণ্ডারী আন্দামানে তাঁর রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তাঁর বিষয় ছিল ‘যুদ্ধকালীন সাংবাদিকতা’। এছাড়া উপদ্রুত অঞ্চলে কিভাবে সংবাদ সংগ্রহ এবং পরিবেশন করতে হয় সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন টাইমস্ অফ্ ইন্ডিয়ার উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রমুখ সাংবাদিক নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উপস্থিত সকলকে অবহিত করে বলেন, সাংবাদিকদের ‘অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট’ জানতে হবে। এসময়ে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ে লেখার প্রভূত সুযোগ রয়েছে বলে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করেন। চারজন বক্তাই শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এদিনকার সাংবাদিকতা কর্মশালায় বিভিন্ন পত্রিকায় কর্মরত এবং বর্তমানে সাংবাদিকতা ও জনসংযোগ বিষয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন হিন্দুস্থান সমাচারের সর্বভারতীয় প্রমুখ লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা এবং সাপ্তাহিক স্বস্তিকার সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য। শ্রী ভালা উপস্থিত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের জন্য হিন্দুস্থান সমাচারে যোগদানের আহ্বান জানান। এদিন পুরো কর্মশালা পরিচালনা করেন আকাশবাণীর সংবাদ পাঠক প্রবীর ভট্টাচার্য। বিকেল তিনটেয় কর্মশালা শেষ হয়। অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র তুলে দেন লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা।

মঞ্চে উপস্থিত (বাঁ দিক থেকে) রঞ্জিত রায়, বিজয় আঢ্য, লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা, বাণীপদ সাহা, এস ভাণ্ডারী ও নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্মশালায় উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ।

জাতীয়তাবোধের চেতনায় রাঙানো

দেশাত্মবোধক সমবেত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

অর্ণব নাগ ॥ বিগত আট বছরের মতো এবারও নবমবারের জন্য গত ৬ আগস্ট ভারত বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে কলকাতার বিধাননগরের রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে আয়োজিত হলো দেশাত্মবোধক সমবেত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব এস এন রায়। সম্মানীয় অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট স্থাপত্যবিদ মণিদীপ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতবিকাশ পরিষদের রাজ্যসাধারণ সম্পাদক পরশুরাম মুন্দ্রা ও পরিষদের প্রবীণ কার্যকর্তা ও উপদেষ্টা পুরুষোত্তম দাস-ভুত।

'অসতো মা সদ্‌গময়' স্তোত্রের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করে তার সঞ্চালনার গুরুদায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে যিনি তুলে নিয়েছিলেন, বিশিষ্ট প্রবাসী ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের শুভ মুহূর্তে ইনিই করেছিলেন তার ব্যাখ্যা—'প্রদীপ হলো জ্ঞান ও ভবিষ্যতের প্রতীক।' আর এই জ্ঞানকে সম্বল করেই যে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে হবে সেকথাই উপস্থিত প্রতিযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি। সেইসঙ্গে দেশের আশু বিপদের কথাও মনে করালেন— ''দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা আজ মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে। এখানে তিনটি কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন; প্রথমত, কর্তব্য (ডিউটি), সম্মান (অনার), দেশ (কান্ট্রি)। কর্তব্যই আমাদের দেশের সম্মান তুলে ধরতে পারে।" এই নিষ্ঠাবান কর্তব্যবোধেই, যাঁদের নামে সেই অনুষ্ঠান ভবন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাকুজী ওকাকুরা-কে যিনি লেখনী দিয়ে একসূত্রে গেঁথে ছিলেন সেই সদ্যপ্রয়াত কাজুও আজমা-কে স্মরণ করা হলো শ্রদ্ধার সঙ্গেই অনুষ্ঠান শুরুর গোড়াতেই উজ্জ্বলপ্রভা কুন্ডুর সরস্বতী বন্দনা, এম বি করের বন্দেমাতরম সঙ্গীত পরিবেশনা, স্বামী বিবেকানন্দ ও মা সরস্বতী'র প্রতিকৃতিতে অতিথিদের পুষ্পপ্রদান সব মিলিয়ে দেশাত্মবোধের একটা অন্যরকম আবহ চড়া সুরে বেঁধে দিয়েছিল দেশাত্মবোধক সমবেত সঙ্গীত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানটিকে। এতে কার্গিল যুদ্ধের অমর শহীদ দ্বিতীয় রাজপুতানা রাইফেলসের বৈজয়ন্ত থাপারের মৃত্যুমুখে পতিত হবার পূর্ব মুহূর্তে বাবা-মা-কে লেখা অনন্যসাধারণ একটি চিঠির উল্লেখ করে তাতে অন্য মাত্রা যোগ করলেন অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের সঞ্চালক নৃপেন আচার্য।

এস এন রায় তাঁর বক্তব্যে আগাগোড়াই সরব ছিলেন পশ্চিমী ভোগবাদের বিরুদ্ধে। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ হবার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি স্বার্থপরতা ও দেশের মানুষের প্রতি নির্বিকারতার ভয়াবহতা সম্বন্ধেও সচেতন করিয়ে দেন। আর এ প্রসঙ্গেই তিনি টেনে আনেন স্বামী বিবেকানন্দের কথা। বলেন, ''স্বামীজী যত না আধ্যাত্মিক বা দেশাত্মবোধের কথা বলেছেন, তার থেকেও বেশি বলেছেন মানবিক মূল্যবোধের কিছু কথা। যেগুলি আগামী প্রজন্মের জন্য আজকের দিনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।" স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ 'সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ' এবং 'বসুধৈব কুটুম্বকমে'র মহাবাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণবানন্দের আদর্শে দেশ গঠনের আহ্বান জানান ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' মহামন্ত্র যে আসমুদ্রহিমাচল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে মাতিয়ে দিয়েছিল সেই জাতীয়তাবাদী পরশ দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই ফিরে আসবে বলে আশা প্রকাশও করেন তিনি।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলির মধ্যে ছিল সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স, ভারতীয় বিদ্যাভবন, সল্টলেক শিক্ষানিকেতন এবং বেগম রোকেয়া স্মৃতি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়। প্রতিযোগীরা ভারত বিকাশ পরিষদ নির্ধারিত 'চেতনা কি সুর' নামক গানের বই থেকে গেয়ে শোনান এই হিন্দী গানগুলি—'চন্দন হ্যায় ইস দেশকি মাটি', 'জিসনে মরনা শিখ লিয়া হ্যায়', 'আপনি ধরতি আপনা অম্বর', 'জয় ভারত বন্দেমাতরম'। এছাড়াও যে বাংলা গানগুলো তাঁরা গান সেগুলো হলো—'গঙ্গা-সিন্ধু নর্মদা' (নজরুল-গীতি), 'আজ যত যুদ্ধবাজ' (গান— শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুর— ভি বালসারা), 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' (রবীন্দ্রসঙ্গীত) এবং 'ওই আকাশের একটাই রং' (গান— সুব্রতনাথ মুখোপাধ্যায়, সুর— কল্যাণ সেন-বরাট)। প্রতিযোগিতার বিচারকরা ছিলেন তিন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী— সুরঞ্জনা চৌধুরী, সুক্তি চৌধুরী এবং অমিত ঘোষ। এই পর্বটি পরিচালনা করেন এম বি কর।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে ভারত বিকাশ পরিষদের সারা দেশের ৫২টি প্রান্তে, ১২০০টি শাখা। সদস্য সংখ্যা ৮৫,০০০। এ রাজ্যে শাখার সংখ্যা ২৩। এর মধ্যে ১৪টি গ্রামীণ, বাকি ৯টি শহর এলাকায়।

আন্দোলনের প্রতীক হোন শ্রীকৃষ্ণ

নটরাজ ভারতী

শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে আন্দোলন হোক, সারাদেশ জুড়ে। তার প্রেম প্রচারের জন্য নয়। গোপীদের সঙ্গে লীলা করার জন্যও নয়, নতুন যৌবনের প্রতীক হিসাবে। এই জন্মাষ্টমীতে সব কৃষ্ণভক্তের একটাই শপথ হোক, কৃষ্ণের নামে আন্দোলন। নিজেদের বাঁচাতে হবে। বাঁচাতে হবে কৃষ্ণকে। হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলে কেঁদে দেশের কোনও উপকার হয় না, হাজার বছরে তা প্রমাণিত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বীরত্বের প্রতীক। আজীবন নেতৃত্ব দিয়েছেন দেশরক্ষায়। যুদ্ধ করেছেন। মানুষকে সর্বদা কাজ করার কথা বলেছেন। বলেছেন ক্লীবতা ত্যাগ করো। দুর্বলতা ত্যাগ করো। মৃত্যু ভয়কে জয় করার কথা বলেছেন। শাশ্বত আত্মার কথা বলেছেন। সুখ দুঃখ সমান করার কথা বলেছেন, জন্ম হলে যে মৃত্যু হবেই সেই শাশ্বত সত্যের কথা বলেছেন। জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য লড়াই এর কথা বলেছেন।

আমরা এসব কিছুই শুনিনি। শুধু হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে কেঁদেছি। আমাদের কান্না কৃষ্ণকেও কাঁদিয়ে ছেড়েছে। আমাদের ছোট টিকি বড় টিকি, মোটা ঝোলা সরু ঝোলা এসব কোনও কাজে লাগেনি। হাজার বছরে টুকরো টুকরো হয়েছে দেশ। কৃষ্ণ ভক্তরাও শুধু পড়ে পড়ে মার খেয়েছি আর কেঁদেছি। কৃষ্ণের নামে ন্যাকা কান্নার সেই ট্র্যাডিশন চলছে আজও। প্রতি জন্মাষ্টমীতে জেগে ওঠার সময় হয়েছে এবার, কৃষ্ণকে ধরেই।

দেশ জুড়ে কৃষ্ণ সবচেয়ে জনপ্রিয় ভগবান। এর জনপ্রিয়তা আকাশ ছোঁয়া, এমন জনপ্রিয়তা থাকলে যে কোনও নেতা-নেত্রী বর্তে যেতেন, ভারতে এমন জনপ্রিয়তা আর কারোর নেই। এমন কোনও গ্রাম শহর নেই যেখানে একদল কৃষ্ণ ভক্ত নেই। 'কৃষ্ণনাম' জানেন না এমন ভারতবাসী নেই একজনও। ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর সারা ভারত জুড়েই ঐক্যের প্রতীক। হিমালয়েও কৃষ্ণনাম করলেও কৃষ্ণনাম। তবুও দেশের ওই চরম দুর্দশার কারণ কৃষ্ণনামকারীদের আপাতমস্তক ভণ্ডামো। আমরা শুধু কৃষ্ণের নামে নিজেরা ছ্যাবলামো করছি না অন্যের ছ্যাবলামোকে সমর্থনও করছি। এসব কাজে মতও দিচ্ছে বড় বড় সব গুরু, মহাগুরুরা। কেউ কেউ জগৎগুরু। বিহারের গুরুকে গুজরাটের লোকে চেনে না। বাংলার গুরুকে কেরলের লোকে চেনে না। তবু এরা সব জগতগুরু। এমন অনেক জগতগুরুর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি জগত সম্পর্কে এদের কোনও ধারণাই নেই। হয়ত কোনও বিদেশিনী ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার টানে এসেছিল গুরুকে প্রণাম করতে। ভারতীয় বেদ বেদান্ত উপনিষদ সম্পর্কে জানতে। ব্যস, আর যাই কোথায়। ওমনি গুরু আন্তর্জাতিক। অন্তরে হিন্দু জাতি সম্পর্কে কোনও চেতনা নেই। হিন্দুধর্মের প্রচারের কাজেও গুরু নেই। তবুও তিনি মহাগুরু জগতগুরু।

সম্প্রতি একটি হিন্দী সিনেমায় কৃষ্ণকে নিয়ে অত্যন্ত বাজে গান গাওয়া হয়েছে। কথা, গান, সুর সবই অরুচিকর। এদেশে কৃষ্ণের নাম ভাঙিয়ে গুরু মহাগুরু জগতগুরু সেজে বসে থাকা কাউকে প্রতিবাদ করতে দেখিনি। এত কোটি কোটি কৃষ্ণভক্তের কেউ পথে নামেনি। এর আগে বাংলা সিনেমায় কৃষ্ণের রাধাকে চুমু খেতে দেখেছি। কুরুচিকর গানও শুনেছি। হিন্দু সমাজ অথবা কৃষ্ণভক্তরা কেউ প্রতিবাদ করিনি। প্রতিবাদ না করার ফলে ছ্যাবলামো আরও বাড়ছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মালা-ঝোলা যাদের সঙ্গী, সারাদিন যারা সযত্নে রসতিলক রক্ষা করে, তাদের বহুজনকে বলেছি চলুন না রাস্তায় নামি— অন্ততঃ কলকাতার রাস্তায় একটা প্রতিবাদ মিছিল করি। কৃষ্ণ ভক্তেরা কেউ সাড়া দিলেন না। তাই ভগবানকে নিয়ে ছ্যাবলামো বাড়তে লাগলো।

কৃষ্ণভক্ত বাবাজীরা তাঁদের ভগবানের নাম নিয়ে চূড়ান্ত ছ্যাবলামো করেন দুটি মিথ্যা স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে। একটি হলো কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের নাম প্রচারক মহাপ্রভু অহিংস ছিলেন এবং দ্বিতীয়টি হলো বৈষ্ণব বিনয়। এই দুই মিথ্যা ধারণা আমাদের সর্বনাশ করে দিয়েছে। দেশের সর্বনাশ করেছে। সমগ্র হিন্দুজাতির একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণের জীবনে তো অহিংসার কোনও গল্পই নেই। কেবলই হিংসা, একের পর এক হত্যা, হুমকি দেওয়া, ভয় দেখানো। সেখানে যেমন দরকার। শত্রুকে বশে রাখার জন্য যা যা দরকার কৃষ্ণ তো তাই করেছেন। কৃষ্ণের জীবনে অহিংসা কোথায়। কুরুক্ষেত্র মাঠে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে তো রীতিমতো হত্যায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। জীবনে বাঁচতে গেলে এরকমই দরকার। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে দাবড়ে বল্লেন— ওহে মাথা উঁচু করে বাঁচার মতো বাঁচো— আর আমরা একালের কৃষ্ণভক্তরা দুহাত তুলে বলতে লাগলাম— ''মরিব মরিব সখী নিশ্চয়ই মরিব'' —তাহলে আর কি হবে!

কৃষ্ণভক্তের পরিচিত বাক্যবন্ধনী বৈষ্ণব বিনয়, শ্রীচৈতন্যের নামে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা এটির আমদানী করেছেন। অথচ শ্রীচৈতন্যের জীবনে কোথাও সে বিনয় নেই। কাজীর বাড়ি ভেঙে তছনছ করছিল তারা। বিনয় ছিল না। মাতাল জগাই মাধাই মাতলামো করছিল, কলসীর কানা মেরেছিল। সেই অপরাধে শ্রীচৈতন্য চক্র দিয়ে দুজনের মাথা কেটে ফেলতে চেয়েছিল। এখানেই বা বিনয় কোথায়? চৈতন্যচরিতামৃতে আছে কোনও গ্রামে একভাগ লোক যদি কোনও বৈষ্ণবকে অপমান করে তাহলে সে গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়। এখানেই বা বিনয় কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সবকিছু বলার পর বলেছিলেন— 'যথেচ্ছসি তথা কুরু' অর্থাৎ সব শুনলে এবার যা ভালো বোঝো তাই কর। অর্থাৎ যুগের প্রয়োজনে সমাজের প্রয়োজনে কাজ কর। হিন্দু সমাজ ভারতীয় সংস্কৃতি না থাকলে কৃষ্ণভক্ত থাকবে না। গুরু মহাগুরু জগদ্‌গুরু থাকবে না। সুতরাং নিজেদের স্বার্থেই কৃষ্ণের নামে এক হবে। এক হবার সময় হয়েছে।

শব্দরূপ-৫৯৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

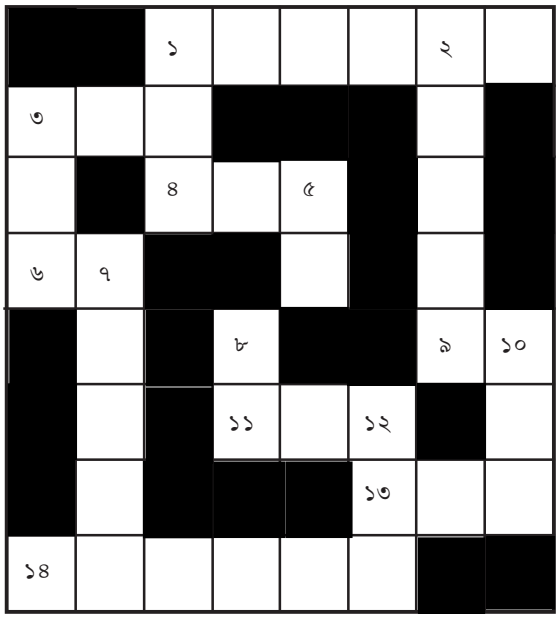

সূত্র :

পাশাপাশি ঃ ১. ব্রত বিশেষ, আহার বর্জন করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় উপবেশন, **৩.** নীচজাতি, **৪.** যযাতির পিতা, **৬.** প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি, **৯.** উলঙ্গ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশেষ, **১১.** পুরাণোক্ত অগ্নিমুখী সমুদ্রঘোটকী, **১৩.** রুদ্রবীণা, **১৪.** আয়ুর্বেদোক্ত আসন্ন মৃত্যু-লক্ষণ।

উপর-নীচ ঃ ১. পাচনবাড়ি, পশুচালন দণ্ড, **২.** শবাসনে বসিয়া তান্ত্রিক সাধনা বিশেষ, **৩.** স্বর্গের পরী, স্বর্গের নৃত্যশিল্পী, **৫.** সন্তানের রক্ষিত্রী দেবী, কৃত্তিকা, **৭.** শাস্ত্রোক্ত আদিমবারি, যাহা হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, **৮.** কষায় রস ও আঠা বিশিষ্ট ফলবিশেষ, তিন্দুক, **১০.** অর্জুনের ধনু, **১২.** ''যদি — কর, গাহিব না'', নিষেধ, হস্তী।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৯১

সঠিক উত্তরদাতা

কৃষ্ণধন দাস
দমদম,
কলকাতা-৩০
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৯৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ১৬

ভিন্ন ভাবনার চিন্তন, নব-চেতনায় অবগাহন

স্বস্তিকা পুজো সংখ্যা, ১৪১৮

—: উপন্যাস :—

নবকুমার বসু, সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত, সুমিত্রা ঘোষ, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

—: প্রবন্ধ :—

আজকের খৃস্টধর্ম যীশু প্রচারিত ধর্ম নয়। সাম্প্রতিক জাপান এবং আমাদের শক্তি ভাবনার পুনর্বিন্যাস। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও পশুপাখি। কেন হিন্দুরা এরকম? হরিশ মুখোপাধ্যায় : নির্ভীক সাংবাদিকতার প্রতীক। চার্চিলের গোপন যুদ্ধ কাদের বিরুদ্ধে? সখারাম গণেশ দেউস্কর— শতবর্ষ পরে। ডিজি-র রবীন্দ্রনাথ।
বাঙালির ভাঁড়ার ঘরের ইতিবৃত্ত। উত্তরবঙ্গের দেবী দুর্গার সন্ধানে।

—: গল্প :—

গোপালকৃষ্ণ রায়, রমানাথ রায়, শেখর বসু, দীপঙ্কর দাস, জিষ্ণু বসু, গোপাল চক্রবর্তী।

—: রম্যরচনা :—

চণ্ডী লাহিড়ী। দেবীবন্দনা—শঙ্কর দেবানন্দ মহারাজ।

এছাড়াও ভ্রমণসহ আরও অনেক কিছু। সব মিলিয়ে পরিবারের ছোটবড় সকলের সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো একটি সংরক্ষণযোগ্য পুজো সংখ্যা।

সত্ত্বর কপি বুক করুন।

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। দাম : ৫০ টাকা।

Swastika RNI No. 5257/57
22 August - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

দাম : ৫.০০ টাকা